বঙ্কিম চেতনায় বঙ্গেতিহাস

গবেষক ঃ
শ্রী দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফালাকাটা কলেজ
ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ডক্টর তপোধীর ভট্টাচার্য্য

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি.
ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ
জুন, ১৯৯৫

SL-VERI
Ref.
80.89
দিলী/বঙ্কি
114048
23 AUG 1996
STOCK TAKING - 2011

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ২৬শে জুন। ১৮৩৮ মৃত্যু : ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগে স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি,
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে ক্ষীণ কণাগুলা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই দুলিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গনি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

ভূমিকা				
প্রথম অধ্যায়	–	ইতিহাস চর্চার প্রেরণা	...	১ - ৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	–	সত্যানুসন্ধিৎসার সাধনা	...	৪৬ - ১০১
তৃতীয় অধ্যায়	–	পটভূমি ইতিহাস	...	১০২ - ১২২
চতুর্থ অধ্যায়	–	ইতিহাস চেতনার পদসঞ্চার	...	১২৩ - ১৫২
পঞ্চম অধ্যায়	–	ইতিহাসের আদর্শায়ন	...	১৫৩ - ১৯১
উপসংহার	–		...	১৯২ - ২০২
গ্রন্থপঞ্জী	–		...	২০৩ - ২১৪

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে ক'জন চিন্তানায়ক জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। কিন্তু রসস্রষ্টা বঙ্কিমের গৌরব - প্রভায় চিন্তানায়ক বঙ্কিমের পরিচয় আজও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। উপন্যাস সৃষ্টির বাইরে তাঁর সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্য ও সুগভীর যুক্তিবাদী মনের পরিচয় বহন করছে। বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস সমূহের সঙ্গে বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে ইতিহাস চেতনার পরিচয় বর্তমান তা' আজও আমাদের মনে বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগায়।

সেই শ্রদ্ধা নিবেদনের তাগিদ থেকেই এই গবেষণাপত্রের জন্ম। আমি আমার গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে 'বঙ্কিমপূর্ব বাংলার ইতিহাস চর্চার ধারা', দ্বিতীয় অধ্যয়ে সেই ইতিহাস চর্চার প্রতিক্রিয়ায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার প্রকৃতি' এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে 'উপন্যাসে বাংলার ইতিহাস প্রসঙ্গ ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের নিষ্ঠা ও চেতনা' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'উপসংহার' টেনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চা ও চিন্তার একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে।

ছাত্রাবস্থাথেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস ও বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি আমার সু-গভীর অনুরাগ ছিল। উত্তরবঙ্গের ফালাকাটা কলেজে অধ্যাপনা করতে এসে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমার এই অনুরাগে সুতীব্র মাত্রাযুক্ত হল। তিনি আমার এই অনুরাগের সঙ্গে অনুসন্ধান প্রবৃত্তিকে অন্বিত করে দিলেন। তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় ও কঠোর শাসনে আমার এই গবেষণা পত্র নির্মিত।

আর দু'জনের কথা বলতে হয়, যাদের কথা না বললে সব বলা অসম্পূর্ণ থাকে, যাদের তাড়না ও প্রেরণায় আমার গবেষণার কাজ শেষ হতে পারল, তারা, শ্রীমতী নন্দা ও শ্রেয়সী ভট্টাচার্য্য, আমার জায়া ও কন্যা।

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাস চর্চার প্রেরণা

স্বদেশ প্রীতি, ইতিহাস প্রীতি, স্বদেশের ইতিহাসহীনতা এবং বিদেশীয় ও বিজাতীয়দের ভ্রান্তিমূলক ইতিহাস-চর্চাই প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে স্বদেশের ইতিহাস বিষয়ে সত্যানুসন্ধিৎসার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। স্বদেশের ইতিহাসহীনতা সম্পর্কে বঙ্কিম-চন্দ্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন – "দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত নাই।"[১] রবীন্দ্রনাথও বেদনাহত কণ্ঠে বলেছেন — "সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী .... আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না ; যদিবা ভারত সাহিত্যে ইতিহাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।"[২]

বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ম্যাকডোনেল একদা অভিযোগের সুরে বলেছিলেন— "History is the one weak spot in Indian literature. It is in fact, non-existance. The total lack of the historical sense is so characteristic, that the whole course of Sanskrit literature is darkened by the shadow of this defect, suffering as it does from an entire absence of exact choronology".[৩] আর এ বিষয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের নিরাসক্ত উক্তি —
"It is well-known fact that with the single exception of the Rajtarangini (History of Kashmir) there is no historical text in Sanskrit dealing with the whole or even parts of India."[৪]

আধুনিক যুগে, পন্ডিতজন স্বীকৃত ইতিহাস লিখন প্রণালীর বিচারে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইউরোপ ভারতবর্ষের তুলনায় প্রাচীনত্বের দাবী রাখে — এ মত সত্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চেতনার অভাব ছিল এবং প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাস

রচনার মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, এ মত সর্বাংশে সত্য নয়।

'ইতিহাস' কথাটি আমরা প্রথম পাই অথর্ববেদ-সংহিতাতে। যথা — "তমিতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্।"[৫] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী — এই চারপ্রকার লৌকিক সাহিত্য প্রচলিত ছিল। নারাশংসী হল পুরোহিত ও রণসঙ্গীত গায়কদের দ্বারা গীত রাজাদের মহত্ত্ব ও বীরত্বমূলক কীর্তিকথা, আর গাথা বলতে আমরা বুঝি লোকচিত্তাকর্ষক কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত গীতি কবিতা। কিন্তু এখানে ইতিহাস ও পুরাণ শব্দের দ্বারা সঠিক কি বোঝান হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। খুব সম্ভব 'পুরাণ' কথার অর্থ অতিপ্রাচীন কাহিনী এবং ইতিহাস বলতে বোঝান হয়েছে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ঘটনার বিবরণকে।

পরবর্তীকালে 'ইতিহাস' কথাটি আমরা মহাভারতে পেয়েছি, এবং সেখানে ইতিহাসকে পুরাণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করা হয়েছে। যথা —

"পুরাণ সংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্মার্থ সংশ্রিতা।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণাম ঋষীণাঞ্চ মহাত্মনাম।।"[৬]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ইতিবৃত্তের আলোচ্য বিষয় রাজা ও ঋষিদের বিবরণ, আর পুরাণে থাকে প্রধানত ধর্মবিষয়ক প্রাচীন কাহিনী।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদের পরে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়েছে — "ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বণশ্চতুর্থ ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমঃ।"[৭] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ইতিহাসকে পঞ্চমবেদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং ইতিহাস কথাটির তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যাও আমরা প্রথম পাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে — "পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ।"[৮] আধুনিক কালের ঐতিহাসিক কৌটিল্যের এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন —

"It would thus appear that Itihasa, as understood by Kautilya, not only included historical Chronicles in the widest sense of

the term, but many things more, and may be said to comprise almost all the topics concerning a man outside the sphere of religion. It seems to embress the study not only of historical persons and events, but also of traditions concerning them,the political, social, moral and economic thories and their practical applications, legal usages and institutions etc." ১

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শুধু 'ইতিহাস' কথাটির তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যাই নেই, সেই সঙ্গে অতি উচ্চাঙ্গের ইতিহাস-লিখন-প্রণালী সম্পর্কে প্রকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে। দ্বাদশ শতকে 'রাজতরঙ্গিণী' অথবা কাশ্মীরের ইতিহাস প্রণেতা কল্হণ ইতিহাস প্রণয়নের যে সব আদর্শ ও প্রণালীর কথা বলেছেন তা' থেকে প্রমাণ হয় যে, সে যুগেও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার মূল সূত্রগুলি অজ্ঞাত ছিল না। কল্হণ স্পষ্ট বলছেন –

" শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষ - বহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী।। ১০

অর্থাৎ সেই গুণবানই প্রশংসনীয় (শ্লাঘ্য) ভূতার্থ কথনে (ইতিহাস কথনে) যাঁর বাণী (সরস্বতী) বিচারকেরই মতো (স্থেয়স্যেব) রাগদ্বেষ - বর্জিত। ঐতিহাসিকের বিবরণে অযৌক্তিক প্রীতি অথবা বিরূপতার স্থান নেই। কারণ, ইতিহাস শুধুমাত্র সত্য এবং একমাত্র সত্যকাহিনী।

আধুনিককালের ঐতিহাসিক কল্হণের কৃতিত্ব বিচার করতে গিয়ে বলেছেন — "Kalhana had the supreme merit of possessing a critical mind and that sperit of scepticism which is the first virtue of a historian. He questioned the veracity of past historians, and examined their statements in the light of available evidence culled from the various sources mentioned above. He found fault with the pedantic style of Suvrata, who had acquired celebrity by epitomizing the volumious works containing the early history of the kings of Kashmir; he corrected the error which Ksmendra Committed

in his 'List of Kings' owing to an incomprehensive lack of care; and he scrutinized eleven works of former savants containing the annals of kings, as well as the views of Sage Nila (VV.11-14)".[১১]

তবে প্রাচীন ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রাচীন ভারতে কল্‌হণ একমাত্র ঐতিহাসিক এবং 'রাজতরঙ্গিণী' একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সাহিত্যের অভাব সম্পর্কে ম্যাকডোনেল প্রধানত দুটি কারণের কথা বলেছেন — "In the first place, early India wrote no history because it never made any, secondly, the Brahmans, whose task it would naturally have been to record great deeds, had early embraced the doctrine that all action and existance are a positive evil, and could therefore have felt but little inclination to chronicle historical events."[১২]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসহীনতা সম্পর্কে ম্যাকডোনেল যে প্রথম কারণের কথা বলেছেন তা' রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমতের মধ্য দিয়ে আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে অনুধাবন করতে পারি — "দেশের লোকের সমগ্র চিত্তে যখন কোনো একটি অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে এবং সর্বসাধারণে সচেষ্ট হইয়া সেই অভিপ্রায়কে সার্থক করিতে চায় ও সেই অভিপ্রায়কে প্রতিকূল আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই সে দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ কোনো একটি এক - অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।

কোনো দেশের লোক যখন এইরূপ ঐক্য উপলব্ধি করে, তখন তাহারা স্বভাবতই সেই উপলব্ধিকে ইতিহাসে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না, যে সকল ঘটনা বিচ্ছিন্ন, যাহা আকস্মিক, দেশের লোকের চিত্তে যাহার কোনো অখণ্ড তাৎপর্য নাই, দেশের লোক

তাহাকে সহজেই ইতিহাস রূপে গাঁথিয়া রাখে না ; কারণ গাঁথিয়া রাখার কোনো একটি সূত্র তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে পায় না।" [১৩]

দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে গভীর ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় — " ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যু জাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম 'দৈব' অশুভের নাম 'দুর্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত ; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্তা আপনাদিগকে মনে করেন না ; দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগের ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত ; পুরাণেতিহাসে কেবল দেবকীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবানুগৃহীত ; সেখানে দৈবের সংকীর্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোনো কার্যের কেহ নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণকীর্তনের প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।" [১৪]

ভারতবর্ষের ইতিহাসহীনতা এবং ইতিহাসহীনতার কারণ সম্পর্কে যা বলা হল তা' বাংলাদেশের ইতিহাসহীনতা এবং ইতিহাসহীনতার কারণ সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য। বঙ্কিম চন্দ্রের মতে — " যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার।" [১৫] তিনি আরও বলেছেন — " এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে পিতৃপিতামহের নাম জানে না ; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।" [১৬]

ইতিহাসহীনতা বাঙালির প্রধান কলঙ্ক। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নেই। তবে ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমতার কারণেই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসহীনতার দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনের জন্য আমরা প্রথমতঃ সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্যটির কথা উল্লেখ করতে

পারি। তবে 'রাজতরঙ্গিণী' তে যেমন ধারাবাহিক ভাবে কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে 'রামচরিতম্' কাব্যে তেমন ভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস বলা হয়নি।

'রামচরিতম্' কাব্যটির রচনাকাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং কাব্যবর্ণিত ঘটনার কবি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কাব্যটির একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে আবিষ্কার করেন এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। চারটি পরিচ্ছেদে রচিত এই কাব্যটি " ভারতীয় সাহিত্যে বোধ করি প্রথম সমসাময়িক (contemporary) ঐতিহাসিক পদ্যকাব্য।"[১৭]

একাদক শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম মহীপালের প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০–৭৫) প্রজাপীড়ন করায় কৈবর্ত নায়কদের নেতৃত্বে, গৌড়রাজ্যের কেন্দ্র ভাগে, বরেন্দ্রদেশে প্রবল প্রজা–বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহীদের হাতে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যু ঘটে। এর কিছুকাল পরে দ্বিতীয় মহীপালের ভাই রামপাল (১০৭৭–১১২০) কৈবর্ত নায়কদের পরাজিত করে বরেন্দ্রদেশ পুনরুদ্ধার করেন। 'রামচরিতম্' কাব্যে সন্ধ্যাকর নন্দী দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় একই সঙ্গে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার কাহিনী ও পালকুলতিলক রামপালের বরেন্দ্রভূমি পুনর্জয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কবি নিজেই কাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত সংস্কৃত টীকা রচনা করে গেছেন এবং তার সাহায্যেই কাব্যের পৌরাণিক অংশের সঙ্গে ঐতিহাসিক অংশের সাদৃশ্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। প্রবোধ চন্দ্র সেন বলেছেন — " গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের একটি দারুণ বিপ্লবের সাক্ষী। ফলে এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ, তাম্রশাসনাদি লেখা - সমূহ থেকে তার মূল্য বেশী বই কম নয়।"[১৮] গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮৯৪) তিন বছর পরে আবিষ্কৃত হওয়ায় এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য আমরা জানতে পারি না।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম চৈতন্যজীবনী গ্রন্থাবলী। মধ্যযুগে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অলোকসামান্য জীবন মহিমার প্রভাবে বাঙালি জাতি একবার হিন্দু–মুসলমান ভুলে, ধর্ম বর্ণ ভুলে, রাঢ়ী বারেন্দ্র ভুলে একাভিমুখী ব্রতের সাধনায় জাগ্রত ও উদ্যত হয়েছিল।

তার প্রমাণ চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরদের চরিতকাব্যসমূহ। কাব্যপর্যায়ভুক্ত হলেও এগুলি ইতিহাস রক্ষার তাগিদে রচিত। এই কাব্যগুলি থেকে বাংলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে ইতিহাস চেতনাও অনৈহিকতা ও অলৌকিকতার মরীচিকায় পথভ্রষ্ট হয়ে অর্দ্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রাচীন বাংলা তথা প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচয়িতা ও ইতিহাস গ্রন্থের অভাব ছিল — একথা সত্য। কিন্তু মধ্যযুগীয় ভারতে মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী (chronicles) যেমন ছিল প্রচুর, তেমনি ইতিহাস রচয়িতা ও ইতিহাস গ্রন্থের অভাব ঘটেনি। এই সব ইতিহাস রচয়িতার কিছু দুর্বলতা ও আদর্শচ্যুতির কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, তাঁদের ইতিহাস-বোধ ছিল বেশ উচ্চমানের এবং তাঁরা ইতিহাস রচনার শুচিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মধ্যযুগের কয়েকটি বিশিষ্ট ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কাজী মিনহাজ-ই-সিরাজ জোজজানী কর্তৃক ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে (৬৫৮ হিঃ) রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থটির কথা। এই বিরাট গ্রন্থটি ভারতবর্ষ তথা তদানীন্তন মুসলমান জগতের প্রাচীনতম প্রামাণ্য ইতিহাসগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার বিষয়ের কাহিনী সমন্বিত প্রাচীনতম ইতিহাস গ্রন্থ।

সুলতান শামস্-উদ্-দীন ইলুতুৎমীশের পুত্র সুলতান নাশির-উদ্-দীন মাহ্মুদের রাজত্বকালে (১২৬৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন) এবং তাঁরই নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে মিন্হাজ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থ রচনা করেন। 'তবকত' শব্দের অর্থ 'কাহিনী'। 'তবকত'-এর বহুবচন 'তবকাত'। এখানে 'তবকাত-ই-নাসিরী'র অর্থ সুলতান নাসির-উদ্-দীন মাহ্মুদের কাহিনী অথবা তাঁকে উপলক্ষ্য করে লেখা কাহিনী।

ইসলামের অভ্যুদয়ের কাল থেকে আরম্ভ করে আরব-আজমের সমুদয় মালিক ও সুলতানের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক রাজবংশের উপর পূর্ণ আলোকপাত করে তাঁদের কীর্তিসমূহের দৃষ্টান্তগুলিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে ২৩টি ভাগে (তবকাতে) বিভক্ত করে মিন্হাজ এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১২২৬–২৭ খ্রিস্টাব্দ (৬২৪ হিঃ) থেকে আরম্ভ করে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ (৬৫৮ হিঃ) পর্যন্ত এই উপমহাদেশে সংঘটিত অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তার আগের ঘটনাবলীর অর্থাৎ সুলতান মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সময় থেকে আরম্ভ করে ৬২৪ হিজরী সনে (১২২৬–২৭ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থকারের সিন্ধু-রাজ্যে আগমন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের যে সমস্ত ঘটনার বিবরণ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেগুলি তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মুখ থেকে শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

'তবকাত্–ই–নাসিরী' গ্রন্থকে ভারতবর্ষে মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ বলা যায় না। এর আগে, ১২২৮–২৯ খ্রিস্টাব্দে (৬২৬ হিঃ) 'তাজ–উল–মাসির' নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন হাসান–নিজামী। এই গ্রন্থে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে সংঘটিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত অথচ মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আছে। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বিশেষ কোন বর্ণনা এ গ্রন্থে প্রায় নেই। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলমানদের রচিত প্রথম ইতিহাস হিসাবে 'তবকাত্–ই–নাসিরী' গ্রন্থের কথা স্মরণ করতে হয়।

মিন্‌হাজ তাঁর গ্রন্থের ২০, ২১ ও ২২ তবকতে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। শুধু দুই বছরের (৪৪১ ও ৪৪২ হিঃ) ঘটনাবলীর তিনি প্রত্যক্ষ-দর্শী ছিলেন। মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী কর্তৃক নওদীহ্ অধিকারের সময় থেকে আরম্ভ করে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াস–উদ্–দীন খলজীর পরাজয় পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে যে সমস্ত ঘটনা মিন্‌হাজের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে সেগুলি সম্পর্কে গ্রন্থকারের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিলনা। কারণ, মিন্‌হাজ সর্বপ্রথম ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে রচিত সে সময়কার যে সমস্ত বিবরণ মিন্‌হাজ তাঁর গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত করেছেন তাতে এমন অনেক বিষয় আছে যা অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। সে সমস্ত বর্ণনার উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা কঠিন। তবে মোটামুটি ভাবে সে সমস্ত বর্ণনার কাঠামো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে ; যদিও বিস্তারিত বর্ণনায় অনেক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই, বঙ্কিমচন্দ্র

মিন্‌হাজ বর্ণিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীকে মেনে নেননি।

বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে মিন্‌হাজের গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁর বর্ণনা ভিন্ন বাংলাদেশ সম্পর্কে সে যুগে আর কোনো ইতিহাস কেউ লিখে গেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। শত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও মিন্‌হাজের বর্ণনাই একমাত্র সূত্র যার থেকে সে যুগের বাংলাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা করা যায়। গ্রন্থটির গুরুত্ব আমরা আরও বেশী করে উপলব্ধি করি যখন দেখি যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (২য় খন্ড) গ্রন্থে পদে পদে পাদটীকায় 'তবকাত্‌-ই-নাসিরী' গ্রন্থটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

'তবকাত্‌-ই-নাসিরী' গ্রন্থটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে W.N.Less- এর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম কলকাতায় মুদ্রিত হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি Major H.G. Raverty-র হাতে পড়ে। গ্রন্থটি তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তিনি মুদ্রনে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন। পরে তিনি ১২টি পান্ডুলিপি সংগ্রহ করে গ্রন্থটি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তিনি গ্রন্থটির প্রথম ছ'টি তবকাত্‌-এর অনুবাদ দেননি, পরিবর্তে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। পরবর্তী ১৭টি তবকতের প্রায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন। তিনি গ্রন্থমধ্যে যে বিস্তারিত পাদটীকা দিয়েছেন তা' অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রন্থটি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

"On June 23, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began."[১১] মধ্যযুগের অবসানে, বাংলাদেশে আধুনিক যুগের আগমন হল। পলাশীর যুদ্ধে বঙ্গবিজয়ের পর ইংরেজ এক নতুন শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত ; তাহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গর্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য ; ....।"[20] এই গর্বিত জাতির হাত ধরেই বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার সূচনা।

আধুনিক যুগে, বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার সূচনা পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পরে, ইংরেজ শাসকদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে। ১৭৬৩–৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন শাসক হেনরী ভ্যান্‌সিস্টার্ট (১৭৬০–৬৪) - এর উৎসাহে সলিমুল্লা ফার্সি ভাষায় 'তরিখ–ই–বঙ্গাল' নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের ইতিহাস সংকলন করেছেন। এক হিসাবে আধুনিক কালে বাংলার ইতিহাস সংকলনের এটাই প্রথম প্রয়াস। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস গ্লাডউন 'A Narrative of Transaction of Bengal' নামে 'তরিখ–ই–বঙ্গাল'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। পরবর্তীকালে গোলাম হুসেন সলিম তাঁর 'রিয়াজ–উস–সলাতিন' গ্রন্থটি রচনার সময় 'তরিখ–ই–বঙ্গাল' থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে 'সয়ের - মুতাক্ষরিণ' নামক গ্রন্থে ফার্সি ভাষায় বাংলার নবাবী আমলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেন সৈয়দ গোলাম হোসেন খান্ তবাতবাই। গ্রন্থে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনা গ্রন্থকারের জ্ঞানগোচর ছিল। কারণ, এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান হিসাবে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে এবং পরে স্বয়ং জীবনের অনেকটা সময়ই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব দরবারে কাটিয়েছেন।

গ্রন্থটির হ্রস্ব নাম 'সয়ের–মুতাক্ষরিণ'। তবে গ্রন্থটির পূর্ণনামেই এর তাৎপর্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা বোঝা যায়। পূর্ণনামের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ : "লেখকের দৃষ্টিতে বর্তমান যুগ (১৭০৭–৮৩) : হিন্দুস্থানের শেষ সাতজন সম্রাটের রাজত্বকালের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলা ও সুজাউদ্দৌলার পরিবারের উত্থান–পতনের বিস্তারিত বিবরণ সহ বিশেষ ভাবে বাংলায় ইংরেজদের যুদ্ধাবলীর একটি বিবরণ সম্বলিত এবং এই অঞ্চলে ইংরেজ সরকার ও তার শাসননীতি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিচার বিশ্লেষণ পুষ্ট।"

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের এক দীর্ঘপর্বের (১৭০৭–৮৩) ইতিহাস প্রথম লিপিবদ্ধ করেন সৈয়দ গোলাম হোসেন। কেন এই পর্বটি বাছা হল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন — "... For it is certain, that to this day no one has thought of filling up the chasm, by writing

the history of India since Aoreng-zib's demise. It is then, to put such a clue in his power, that I have imposed on myself this task : trusting therefore to my personal knowledge, and to what I have gathering from persons of eminent rank and credit, I have sturng the whole together in a plain unornamented style, where my errors shall be the more excusable, as a cite perpetually my authorities; and by God's blessing, I have entitled it "SEIR-MUTAQHERIN" (View of moderns time), as containing the whole series of events, from the year 1118 to the year 1195 since the venerable flight to the last and chief of messengers down to the present days."[২১]

প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই ইতিহাস গ্রন্থটি ওয়ারেন হেস্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু, বোধ হয়, সে সময়ে ইংরেজদের মধ্যে পারসিক জানা পন্ডিত ছিলেন না অথবা তাঁদের অনুবাদ করার মতো হাতে সময় ছিল না ; এই কারণে একজন ফরাসি কর্ণেল M. Raymond গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব নেন এবং ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে 'NOTA MANUS' এই ছদ্মনামে গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

যে সময়ে এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল তখনও ভারতে ইউরোপীয় ইতিহাস লিখন প্রণালীর প্রভাব অনুভূত হয় নি। সে সময়ে এটাই ছিল কোন ভারতীয়ের রচিত সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনার নিদর্শন। গোলাম হোসেন ইতিহাস প্রণয়ণের প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা' মোটামুটি ভাবে মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিহাস রচয়িতাদের বক্তব্যের পুনরুক্তি। তাঁর মতে, ইতিহাস ভগবানের সৃষ্টির সর্বমহৎ অংশের উপর এক ঝলক আলোকপাত করে এবং মানবসমাজের বিভিন্ন জাতির তথ্য সংগ্রহ করে, তাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ, প্রধান নেতাদের গুণরাজি ও অনুগামীদের কার্যাবলীর পরিচয় দেয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল, নীচতা, অনম্রতা ও অত্যাচারের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অপরকে হুঁশিয়ার করা এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপ ও ব্যবহার থেকে তাদের রক্ষা করা।[২২]

James Mill এবং H.H.Willson তাঁদের 'History of British India' গ্রন্থে H.G.Keene তাঁর 'The Fall of the Mughal Empire' গ্রন্থে H.M.Elliot তাঁর 'The History of India as told by its own Historians' গ্রন্থে Charles Stewart তাঁর 'The History of Bengal' গ্রন্থে 'সয়ের-মুতাক্ষরিণ' থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং সকলেই গ্রন্থটির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, পলাশীতে প্রকৃত পক্ষে কোন যুদ্ধ হয়নি, কেবল একটা রঙ্গতামাশা হয়েছিল মাত্র। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মুতাক্ষরিণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। [২৩] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রও মুতাক্ষরিণের বক্তব্যকে প্রামাণ্য বলে ধরেছেন।

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মালদহ অঞ্চলের কর্মচারী জর্জ উডনির নির্দেশে তাঁর ডাকমুন্সী গোলাম হুসেন সেলিম ফার্সি ভাষায় তাঁর সমসাময়িক কালের একটি ইতিহাস রচনা শুরু করেন এবং দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটির নাম রাখেন তিনি ''রিয়াজ-উস-সলাতিন'।' 'রিয়াজ' শব্দের অর্থ উদ্যানসমূহ এবং 'সলাতিন' শব্দের অর্থ 'নৃপতিবৃন্দ। ইংরেজি করে বলা যায় 'Gardens of Kings'.

এই গ্রন্থে তিনি প্রধানত মুসলমানদের বঙ্গবিজয় কাহিনী থেকে শুরু করে ইংরেজদের বঙ্গবিজয় কাহিনী পর্যন্ত ইতিহাসকে বিবৃত করেছেন। গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। চতুর্থ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ আছে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বাংলাদেশে পর্তুগীজ ও ফরাসিদের আগমন কথা এবং দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজদের বঙ্গবিজয় কাহিনী।

এই গ্রন্থ রচনার জন্য গ্রন্থকার গৌড়, পান্ডুয়া ও পুরাতন মালদা অঞ্চলের নানা ধ্বংসাবশেষ ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন ও বহু পুরাতন পুঁথি পাঠ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, লেখক কোন্ কোন্ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা' আমাদের জানান নি। তবে গ্রন্থ মধ্যে তার প্রমাণ আছে। যেমন তিনি মিনহাজের

'তবকাত্-ই-নাসিরী', জিয়াউদ্দিন বার্ণির 'তরিখ-ই-ফিরোজশাহী', নিজামুদ্দিন আহমেদের 'তরিখ-ই-আকবর শাহী', আবুল ফজলের 'আকবর নামা', সলিমুল্লার 'তরিখ-ই-বঙ্গাল' প্রভৃতি গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছিলেন।

গ্রন্থটি সম্পর্কে যদুনাথ সরকার বলেছেন — "মুসলমান শাসিত ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশের পৃথক ইতিহাস পারসিক ভাষায় লেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক পত্রাবলীও রক্ষা পাইয়াছে। বাঙ্গালার পক্ষে সে রূপ ইতিহাস একখানি মাত্র 'রিয়াজ-উস-সলাতিন', তাহাও আবার পলাশীযুদ্ধের ত্রিশ বৎসর পরে ইংরাজ আমলে ইংরাজের আজ্ঞায় লেখা।'[২৪]

'ইংরাজ আমলে ইংরাজের আজ্ঞায় লেখা।' — ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের এই কথার মধ্যে যে আত্মমণের ঝাঁঝ আছে তার প্রধান কারণ বোধ করি যে গ্রন্থ সূচনাতেই লেখক তাঁর নিয়োগকর্তা জর্জ উডনিকে মহৎ চরিত্র, দয়ালু হৃদয়, বিজ্ঞ মানুষ বলে উচ্চ প্রশংসা করে তাঁর সম্মানিত দীর্ঘজীবন ও উচ্চতর পদমর্যাদা কামনা করেছেন এবং গ্রন্থ মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের প্রতি আনুগত্য হেতু ঐতিহাসিকের নিষ্পাচ্যুত হয়েছেন। গ্রন্থ শেষে ইংরেজদের উচ্চ প্রশংসা করে তিনি বলেছেন — "The English among the Christians are adorned with the head-dress of wisdom and ornamented with the garb of generosity of good maners. In resolution, activity in war and in festivities, in administering justice and helping the oppressed, they are unrevalled; and their truthfulness is so great, that they would not break a promise, should they even lose their lives. They admit no lier to their society, are pious, faithful, pitiful and honerable. They have neither learnt the letters of deceit, nor have they read the page of vice; and though their religion is opposed to ours, they do not interfere with the religion, rites and propagation of the Muhammadan faith."[২৫]

উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান প্রভৃতি সকলের প্রধান অবলম্বন ছিল 'রিয়াজ-উস-সলাতিন'। তাঁরা সকলেই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু যদুনাথ সরকারের মতে — "মখ্‌জন্‌ ও আকবর নামার বিরুদ্ধে যে যে স্থানে রিয়াজ কোন উক্তি করিয়াছেন, তাহা একেবারে বিবেচনার অযোগ্য। এবং তাহা লইয়া আলোচনা করাও সময়ের অপব্যবহার মাত্র; কারণ, ১৭৮৭ সালে লিখিত এই পুস্তকে গ্রন্থকর্তা কোনই প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধৃত, এমন কি, নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। সূক্ষ্মভাবে রিয়াজ পরীক্ষা দেখা গেল যে, গ্রন্থকার মালদহে বসিয়া আকবর নামা, মখ্‌জন্‌ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ একেবারেই পান নাই; তৃতীয় শ্রেণীর কোন আধুনিক সংকলন মাত্র পড়িয়াছেন।" [২৬] ১৯০৪ সালে আবদুস সালাম গ্রন্থটির সটীক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে গ্রন্থটির কোন ইংরেজি অনুবাদ না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন নি। ফলে গ্রন্থটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য আমরা পাই না।

আমরা আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল ইংরেজ শাসকদের উৎসাহে। 'তরিখ-ই-বঙ্গাল', 'রিয়াজ-উস-সলাতিন' প্রভৃতি গ্রন্থ সে উৎসাহ ও প্রেরণারই ফসল। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাস-রচনা-প্রণালী বলতে আমরা যা বুঝি এই সব গ্রন্থের ক্ষেত্রে সে রচনাশৈলী অনুসৃত হয়নি। গ্রন্থগুলি মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিক-দের ইতিহাস-চেতনা ও রচনা-প্রণালী অনুসারে লিখিত। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ইউরোপীয় ইতিহাস-রচনা - প্রণালী অনুসারে, আধুনিক প্রণালীতে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার (১৭৮৪) মধ্য দিয়ে।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোন্সের ভারতে আগমনের অনেক আগেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে এদেশে আসেন চার্লস উইলকিন্স (১৭৫০-১৮৩৫)। তিনিই বাংলা টাইপের নির্মাতা এবং বাংলা মুদ্রণের পথ প্রদর্শক। তাঁর প্রবর্তিত বাংলা টাইপের প্রথম প্রয়োগ হয় হ্যালহেডের ইংরেজি ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮)। খুব সম্ভব হ্যালহেডের কাছে উৎসাহ পেয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন এবং বারাণসীতে গিয়ে পণ্ডিতদের কাছে খুব ভালোভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। উইলকিন্সই সংস্কৃত জানা প্রথম ইংরেজ। তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রথম 'ভাগবদ্‌গীতা'র অনুবাদ

(১৭৮৫) করেন। এই অনুবাদই কোনো সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ। এরপর তিনি 'হিতোপদেশ' (১৭৮৭) ও মহাভারতের 'শকুন্তলা' উপাখ্যানের অনুবাদ (১৭৯৫) করেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রথম ছাপার কাজে দেবনাগরী হরফ ব্যবহৃত হয়। উইলকিন্সের রচনাবলীই ভারতবিদ্যাচর্চার সূত্রপাত করেছিল এবং সেগুলি পাঠ করে ইউরোপের পন্ডিত—মন্ডলী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি রূপে উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬—৯৪) ভারতবর্ষে আসেন। সুপন্ডিত ও বহুভাষাবিদ জোন্স ভারতে আসার আগেই প্রাচ্যদেশ সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা জানতেন এবং ভারতে আসার তিন বছরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি উইলিয়ম জোন্সের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় আগ্রহী উইলিয়ম জোন্স, স্যার রবার্ট চেম্বার্স, জন হাইড, হেনরী ভ্যান্সি-টার্ট, স্যার জন শোর, ফান্সিস গ্লাডউইন, চার্লস উইলকিন্স প্রভৃতি তিরিশজন ইউরোপীয়কে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সকলেই — "Agreed that the Society be established for the purpose of inquiring into the History and Antiquity, Art, Science and Literature of Asia."[২৭]

এই সভায় উইলিয়ম জোন্স " Discourses on the Institution of a Society for enquiring into the History civil and natural, the Antiquities, Arts, Sciences and Literature of Asia."
নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে সভা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জোন্স বলেন — ".... You will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature, will correct the geography of Asia by new observations and discoveries; will trace the annals, and

114048
23 AUG 1996
NORTH BENGAL
University Library
Raja R...

even traditions, of these nations, who from time to time peopled or desolated it; and will bring to light their various forms of government, with their institutions civil and religious; you will examine their improvements and methods in arithmetic and geometry, in trigonometry, mensuration, mechanics, optics, astronomy and general physics; their systems of morality, grammar, rhetoric and dialectic; their skill in chirurgery and medicine, and their advancement, whatever it may be, in anatomy and chemistry. To this you will add researches into their agriculture, manufactures, trade; and whilst you inquire with pleasure into their music, architecture, painting and poetry, will not neglect these inferior arts by which the comforts and even elegancies of social life are supplied are improved." [১৮]

জোন্সের এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কর্মধারা ছিল বহুবিচিত্রপথগামী।

জোন্সের এই প্রবন্ধ পাঠের পর সভায় উপস্থিত সকলে — "Resolved that the thanks of the Society be presented to Sir William Jones for the discourse with which he has favoured them. The Society agreeable to thepurport of the above discourse now assumed to themselves the name of the 'ASIATICK SOCIETY'." [১৯]

সোসাইটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২২শে জানুয়ারী, ১৭৮৪। এই সভায় ওয়ারেন হেস্টিংসকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই মর্মে অনুরোধ করে তাঁকে চিঠি দেওয়া হয়। তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে জানুয়ারী, ১৭৮৪। ৩০শে জানুয়ারী, ১৭৮৪ ওয়ারেন হেস্টিংস সময়ের অভাবে সভাপতির পদ গ্রহণে অস্বীকার করে চিঠি দেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৪ সোসাইটির চতুর্থ সভায় উইলিয়ম জোন্সকে সর্বসম্মতভাবে সভাপতি

নির্বাচন করা হয়। জোন্স আমৃত্যু (২৭শে এপ্রিল, ১৭৯৪) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উইলিয়ম জোন্স ভাল সংস্কৃত জানতেন এবং শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ (১৭৮৯), গীতগোবিন্দের ইংরেজি অনুবাদ (১৭৯১) ও ঋতুসংহার সম্পাদনার (১৭৯২) জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পান্ডিত্যের প্রকৃত খ্যাতি নিহিত আছে এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন সভা ও পত্রিকার জন্য লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী, এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধে উইলিয়ম জোন্স বলেছিলেন — "The Sanskrit Language, whatever be its antiquity, is of a wanderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to boath of them a strong affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; So strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists." [৩০]

জোন্সের এই বক্তব্যই পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রেরণার সঞ্চার করে এবং উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ঐতিহ্যচেতনা যুক্ত হয়ে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে।

পরবর্তীকালে জোন্সের এই বক্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে ভাষাচার্য্য সুনীতি কুমার বলেছেন — " এই যে, দিব্যদৃষ্টিতে স্যার উইলিয়ম জোন্স দেখিলেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন পারসিক, কেল্টিক, গথিক প্রভৃতির পশ্চাতে তাহাদের জননী স্বরূপ এক আদি আর্যভাষা বিদ্যমান ছিল, ইহারই আধারে ইউরোপে কতকগুলি নূতন মানবিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হইল — যেমন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বাক্‌তত্ত্ব ইত্যাদি। " [৩১]

আধ ইঞ্চি হবে। ১, ২, ২৩, ২৫, ও ২৭ সংখ্যক শ্লোকের কোন কোন অক্ষর প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অন্যান্য অক্ষরাবলী অত্যন্ত সুদৃশ্য ও সুখপাঠ্য।

এই লিপি থেকে আমরা ধর্মপাল, দেবপাল, শূরপাল (মতান্তরে প্রথম বিগ্রহ পাল), নারায়ণ পাল প্রভৃতি পালবংশীয় রাজাদের নাম জানতে পারি। আমরা জানতে পারি যে, পালবংশীয় রাজারা বাঙালি ছিলেন এবং তাঁরা প্রথমে বাংলাদেশ অধিকার করে পরে মগধ জয় করেন। স্তম্ভলিপির ত্রয়োদশ পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, গৌড়েশ্বর (দেব পালদেব) উৎকলকুল উৎকিলিত করে, হূনগর্ব খর্ব করে, দ্রাবিড় গুর্জরনাথ গর্ব খর্ব করেছিলেন।

চার্লস উইলকিন্স মুদ্রাযন্ত্রে বাংলা টাইপের ব্যবহার করে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন, অপরদিকে তেমনি গরুড়-স্তম্ভ লিপি আবিষ্কার এবং তার ইংরেজি মর্মানুবাদ প্রকাশ করে বাংলা পুরাতত্ত্ব সাধনার ক্ষেত্রে সূত্রধারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উইলকিন্সের পরে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে হেনরী টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭)-এর নাম করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে কোলব্রুকই বাঙ্গার প্রত্নতত্ত্ব চর্চার প্রতিষ্ঠাতা ; তিনিই জোন্সের আরব্ধ অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার প্রয়াস করেন।

দিনাজপুর জেলায় আবিষ্কৃত রণকঙ্কমল্লদেবের ময়নামতী লিপি এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের আমগাছি লিপির মূল সংস্কৃত পাঠসহ কোলব্রুক কৃত ইংরেজি অনুবাদ ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে Asiatic Researches পত্রিকায় (Vol.IX, P.398-407 and P.442-446) প্রকাশিত হয়। এর ফলে কোলব্রুকের হাতেই বাংলাদেশে প্রত্ন-তত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত ঘটে।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায়, বাদাল থেকে চোদ্দ মাইল দূরে সুলতান-পুরের আমগাছি গ্রামে এক কৃষক মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি তাম্রশাসন পায়। তাম্রশাসনটি সে পুলিশের কাছে জমা দিলে সেটি ম্যাজিস্ট্রেট জে.পয়টেলের মাধ্যমে এশিয়াটিক সোসাইটিতে আসে। ১৪ ইঞ্চি উঁচু ও ১৩ ইঞ্চি চওড়া কারুকার্য খচিত পিতলের ফ্রেমে আবদ্ধ এই

তাম্রশাসনটি একটি দানপত্র। দানপত্রটি দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। দাতা তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব। দাতা এই দানপত্রে তাঁর পূর্বপুরুষদের নামোল্লেখ করেছেন। কোলব্রুক নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত নামোল্লেখের পাঠ নিয়েছেন — "The first prince mentioned is LOCAPALA, and after him DHARMAPALA. The next name has not been decyphered; but the following one is JAYAPALA, succeeded by DEVAPALA. Two or three subsequent names are yet undecyphered [one seems to be NARAYANPALA]; they are followed by RAJAPALA, — PALADEVA, and subsequently MAHIPALADEVA, NAYAPALA and again VIGRAHAPALADEVA." [৩২]

পরবর্তীকালে এই আমগাছিলিপি এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত গরুড়-স্তম্ভলিপির সাহায্যেই ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের পালরাজবংশের মূল কাঠামোটি জানতে পারেন।

শুধু রাজবংশের ইতিহাস নয়, কোলব্রুক বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনারও সূত্রপাত করেন। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে Asiatic Researches পত্রিকায় (Vol.VI, P.53-67) প্রকাশিত কোলব্রুকের 'Enumaration of Indian Classes' প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনার সূচনা হয়। কোলব্রুক বলেছেন, এই প্রবন্ধ লেখার জন্য — ".... I shall use, is the Jatimala, or Garland of classes; an extract from the Rudrayamala Tantra, which in some instances corresponds better with usege, and received opinions, than the ordiance of MENU, and the great D'herma-Purana." [৩৩]

কোলব্রুকের এই প্রবন্ধের পর আজ প্রায় দু'শ বছর পূর্ণ হতে চলল, কিন্তু বাঙালির দুর্ভাগ্য এই যে, আজও বাঙালির পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচিত হল না।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত Asiatick Researches পত্রিকাটি যে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি পত্রিকার কথা বলব, যার জন্য Asiatick Society নামটি পরিবর্তিত হয়ে Asiatick Society of

Bengal হয়ে গেল।

১৮২৯ থেকে '৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন হারবার্ট Gleanings in Science নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পরবর্তীকালে জেম্‌স প্রিন্সেপ এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং সোসাইটির অনুমতিক্রমে পত্রিকাটির নাম রাখেন 'The journal of the Asiatick Society', — অন্ততঃ প্রথম সংখ্যায় সে নামই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই নাম পরিবর্তন করে পত্রিকার নামকরণ করেন — 'The journal of the Asiatick Society of Bengal.' খুব সম্ভব, একটি স্থানিক নামের স্বতন্ত্র মাত্রা তিনি দিতে চেয়েছিলেন। এই পরিবর্তন সোসাইটির নজরে আসেনি। পত্রিকাটি Asiatick Researches অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রিন্সেপের অবসর গ্রহণের পর সোসাইটি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন পত্রিকাটির পরিচালন ভার গ্রহণ করে তখন পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই পত্রিকার নাম পরিবর্তন না করে Asiatick Society - র নাম পরিবর্তন করে Asiatick Society of Bengal রাখা হয় এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রনিয়মালী সংশোধনের দ্বারা এই পরিবর্তন স্বীকৃতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে 'Asiatick Society of Great Britain and Ireland' প্রতিষ্ঠিত হলে, তারা কলকাতার Asiatick Society - কে Asiatick Society of Bengal নামকরণের অনুরোধ করেছিল, কিন্তু সোসাইটি তখন সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত Asiatick Researches এবং The journal of the Asiatick Society of Bengal - এই পত্রিকা দুটির সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটি প্রকাশিত প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর কথা বলতে হয়, যার মধ্যে অনেক গ্রন্থই বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য-বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'বিবিলিওথিকা ইন্ডিকা' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির শতবার্ষিকীর সময়, প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক মোট ১৪০টি প্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য গ্রন্থের মধ্যে ১১১টি ছিল 'বিবিলিওথিকা ইন্ডিকা'র অন্তর্গত। এর মধ্যে একদিকে আছে ফারসী ভাষায় রচিত প্রায় সব বিখ্যাত প্রাচীন বই,

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের মূল পাঠের সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ। অন্যদিকে আছে বৈদিক সাহিত্য সংক্রান্ত চব্বিশটি বই, তিনটি পুরাণ, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আইন, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন - "It is doutful if any society in Europe has within fifty years, done any classic literature as much as the Asiatick Society of Bengal has done for Sanskrit literature since 1847." ৩৪

এশিয়াটিক সোসাইটি কেবল গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্বই নেয়নি, সংস্কৃত ও আরবী - ফারসী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সন্ধান ও সংরক্ষণ করেছে। শুধু ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণার কাজই নয়, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, মানচিত্র নির্মাণ প্রভৃতি কাজেও সোসাইটি সমান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাই প্রবোধচন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন — " অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ফরাসি বিপ্লবের ফলে যে সময়ে ইউরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন যুগের সূচনা হচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই উক্ত এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে স্যার চার্লস উইলকিন্স, স্যার উইলিয়ম জোন্স, এইচ.টি.কোলব্রুক-প্রমুখ মনীষী-দের প্রবর্তনায় ভারতীয় সংস্কৃতি জগতের আবিষ্কারের ফলে বাংলা দেশেও এক নূতন যুগের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। আর সে দ্বার হচ্ছে পুরাবৃত্তের দ্বার। এই দ্বারপথে প্রবেশ করে বাঙালির মন ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির যে আশ্চর্য সাতমহলা প্রাসাদ আবিষ্কার করল, তার মহলে মহলে যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেল, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অবশেষে এই পুরাজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে ওই সাতমহলা ভবনের কেন্দ্রবর্তিনী ভারতীয় প্রাণলক্ষ্মী যখন দীর্ঘ-সুপ্তির অবসানে নবপ্রভাতের আলোকে জেগে উঠলেন, তখন দেশে যে নবচেতনার সাড়া দেখা দিল ভারতীয় ইতিহাসে তার তুলনা নেই। ওই প্রবেশ পথেই বাংলা দেশের পুরাবৃত্তের কক্ষচিত্ত ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত হল ; কিন্তু সেই অন্ধকার কক্ষের বিভিন্ন অংশকে যথোচিত আলোকিত করতে অতি দীর্ঘকালব্যাপী পুরচর্চার প্রয়োজন হয়েছে। " ৩৫

আধুনিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস রচনা করেন Charles Stewart. ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর The History of Bengal গ্রন্থটি প্রকাশিত

হয়। গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই গ্রন্থে বাংলাদেশে মুসলমান অভিযান থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বঙ্গবিজয় পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাস আলোচিত হয়নি। তবে বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাসের প্রশ্নে লেখক সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন — "In a work professing to be a History of Bengal, it will probably be expected to find some account of the original inhabitants of the country; and a detail of their gradual rise, from a state of barbarism, to that high degree of civilization in which they were found when first visited by Europeans. In both this respects, I am sorry to say, the reader will be disappointed. Although the Hindoos of Bengal have an equal claim to antiauity and early civilization with the other nations of India, yet we have not any authentic information respecting them during the early ages of their progress; nor is there any other possitive evidence of the ancient existance of Bengal, as a separate kingdom, for any considerable period, than its distinct language and peculair written character." [৩৬]

বাংলাদেশের কোনো "account of the state of the civilization or of the progress of the arts and science" [৩৭] দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে স্টুয়ার্ট দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে, "As I am credibly informed that materials have been and are still collecting for furnishing an authentic account of the Hindu Governments, I shall dwell no longer on the subject, in the hope that we shall one day be favoured with a history of Bengal from the pure mine of Sanskrit Literature." [৩৮]

বাংলার ইতিহাস রচনার সময় স্টুয়ার্ট একাধিক গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন, এবং সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "I have annexed a list of the books consulted in the compilation of this work; not with a view of making a parade of oriental learning, but to evidence that great pains have been taken to collect the best information that could be obtained." ৩১

পাঠকের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তিনি গ্রন্থ মধ্যে বাংলা ও বিহারের পূর্ণাঙ্গ এবং উড়িষ্যা ও আরাকানের আংশিক পরিচয় সমন্বিত একটি মানচিত্র সংযুক্ত করেন এবং ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলার নবাবদের একটি নামের তালিকা দেন।

বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখক তাঁর সীমাবদ্ধতা ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ; সে কারণে তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন — "Many things, however, have probably escaped my attention; and as gentlemen residing in Bengal may by their local inquiries, be enable to detect mistakes and to explain some points upon which I have expressed doubts, I shall consider myself obliged to any person who will furnish me with the means of suppling omission, or of correcting errors." [80]

স্টুয়ার্টের ইতিহাস স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে রচিত হয়নি। কিন্তু Council of Education-এর অনুমোদন ও সুপারিশ ক্রমে সরকারী স্কুল কলেজে গ্রন্থটি পাঠ্য হলে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে এর একটি সরকারী শিক্ষা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ অবলম্বনেই ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটির বঙ্গবাসী সংস্করণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের গ্রন্থের প্রশংসা করতে পারেন নি। বিদ্রূপ করে তিনি বলেছেন — "স্টুয়ার্ট সাহেবের বই এত বড় ভারী যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয় ....।" [৪১] কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, — "We have much pleasure to place

in the hands of the public the best History of Bengal ever written or published. Stewart's History of Bengal is not only the best but also the first work that was ever written on the subject. Ninety years have passed since this book was first published .... Major Stewart's History of Bengal still holds the ground as the standard work on the subject."[৪২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে গ্রন্থটি নিন্দনীয় হলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সে মত পরিবর্তিত হয়েছে।

জাতির হৃদয়ে ইতিহাস চেতনা সঞ্চার করার দুটি পথ আছে — এক, সাহিত্য, দুই, শিক্ষা। চৈতন্যজীবনী কাব্য বাদ দিলে বাঙালির ইতিহাস-সাহিত্য ছিল না। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলাদেশের নবশিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু শিক্ষালয়ে ইতিহাস শিক্ষা তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলে ও বড়লাট বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে বাংলাদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হলে শিক্ষালয়ে ইতিহাস শিক্ষার শুভ সূচনা হল। সিনিয়র সেক্শনের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ভারতেতিহাস' এবং জুনিয়র সেক্শনের জন্য 'বঙ্গেতিহাস' পাঠ্য করা হল। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে খ্যাত-নামা ঐতিহাসিক জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে History of India এবং ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে History of Bengal রচনা করলেন।

History of Bengal গ্রন্থটির পূর্ণনাম 'Outline of the History of Bengal compiled for the use of youths in India'. গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে, "It presents a brief and simple outline of the History of Bengal from the Voidya dynasty to the close of Lord William Bentinck's administration."[৪৩]

বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্য মার্শম্যান যে সব গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, ভূমিকায় তার একটি তালিকা আছে। এইসব গ্রন্থের মধ্যে স্টুয়ার্টের History of Bengal গোলাম হুসেনের 'সয়ের মুতাক্ষরিণ' এবং ফেরিস্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মার্শম্যানের History of Bengal স্টুয়ার্টের History of Bengal অপেক্ষা আকারে ছোট ; উনিশটি পরিচ্ছেদে প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠায় রচিত। কিন্তু প্রকৃতিতে মার্শম্যানের ইতিহাস গ্রন্থটি স্টুয়ার্টের গ্রন্থ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। স্টুয়ার্টের ইতিহাস মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস, সেখানে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার কথা নেই। কিন্তু মার্শম্যান তাঁর গ্রন্থে মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার প্রথম পরিচ্ছেদে — Obscurity of the early history of Bengal, the three ancient capital - Gour, Sonargong and Satgong, Adisoor, Bullal Sen and the Vaidya roll of Kings, Ancient division of Bengal -

এর কথা যেমন বলেছেন তেমনি আধুনিক বাংলার ইতিহাসকে বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন।

প্রসঙ্গত: বলা দরকার যে, যদিও বাংলার সেন রাজারা বর্ণে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু ভুল বশত: মার্শম্যান তাঁদের বৈদ্যরূপে চিহ্নিত করায়, বাংলার সেন রাজারা বৈদ্য ছিলেন, — আজও এই ভুল ধারনা সাধারণ মানুষের মনে সযত্নে লালিত আছে। তবে ইতিহাসের সচেতন পাঠক এ ত্রুটি মুক্ত।

মার্শম্যানের History of Bengal গ্রন্থটি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন শিক্ষালয়ের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত হত। খুব সম্ভব সে কারণেই গ্রন্থটির একাধিক বঙ্গানুবাদ হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন গোবিন্দ চন্দ্র সেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগ অনুবাদ করেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই অনুবাদে পলাশীর যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বেন্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে নবাব আলিবর্দির শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এইভাবে, অনুবাদের মধ্য দিয়েই, বাংলা সাহিত্যে বাংলার ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয় এবং বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে ইতিহাস-চর্চা ও চেতনার প্রসার ঘটে।

এরপর, বেন্টিঙ্কের পরবর্তীকাল থেকে বাংলার ছোটলাট নর্ড বীডনের শাসন-কাল পর্যন্ত (১৮৩২–৬৭) 'বাঙ্গালার ইতিহাস' তৃতীয় ভাগ, রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এটি কোনো ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ নয়, ভূদেবের স্বাধীন রচনা। এই ইতিহাস ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে প্রথমাংশ 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রিকায় এবং শেষাংশ 'এডুকেশন গেজেট'–এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই ইতিহাস–বর্ণিত ঘটনাবলী লেখকের জীবনকালেই (১৮২৭–৯৪) সংঘটিত হয়েছিল এবং লেখক তার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন বলে এই রচনার স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই রচনা ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে রোপার লেথব্রিজ রচিত 'An Easy Introduction of the History and Geography of Bengal নামক গ্রন্থটির কথা বলতে হয়। গ্রন্থটি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য রচিত হয়েছিল। মাত্র ১১৮ পৃষ্ঠায় নয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি রচিত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলা দেশের ভৌগোলিক বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস, তৃতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে মুসলমান রাজত্বের কথা, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ইংরেজ রাজত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় লেখক যে সব ঐতিহাসিকের গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন তাঁদের নামের তালিকা লেখক ভূমিকায় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Prof. Lassen, E.V.Westmacott, Henery Elliot, Prof. Blochmann, E.Thomas এবং Charles Stewort এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্কুল পাঠ্য গ্রন্থের বাইরে, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত W.W.Hunter এর 'The Annals of Rural Bengal' ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত J.Westland–এর 'A Report on the District of Jessore', এবং ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত W.W. Hunter –এর 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থের কথা বলতে হয়। The Annals of Rural Bengal বাংলাদেশের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

A Statistical Account of Bengal গ্রন্থটির প্রায় একই শ্রেণীর রচনা এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ থেকে 'দেবী-চৌধুরাণী' উপন্যাসের উপাদান পেয়েছেন। ওয়েস্টলান্ডের গ্রন্থে যশোহরের ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও বাণিজ্যিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনীর অনেকটাই গ্রহণ করেছেন ওয়েস্টলান্ডের গ্রন্থ থেকে।

এই প্রসঙ্গে 'Contribution to the Geography and History of Bengal' (Muhammedan period) - এই নামে Professor H.Blochmann যে তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেগুলির কথাও স্মরণ করতে হয়। প্রবন্ধগুলি Journals of the Asiatick Society of Bengal এ যথাক্রমে 1873 (Part-I, No.3), 1874 (Part-I,No.f) এবং 1875 (Part-I, No.3-তে প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধে তিনটি রচনা সম্পর্কে লেখক বলেছেন যে, —"In the end of last year, General Cunninghum, Director of the Archaeological Survey of India, forwarded to the Asiatic Society, for publication in the journal, a unique collection rubbings of Mahammedan inscriptions from Bengal and various places up-country, and in the proceedings of our Society for January last. I gave an account of the importance of these rubbings with reference to the history of Bengal." [৪৪]

এই প্রবন্ধ তিনটি রচনার সময় লেখক স্বয়ং শিলালেখ, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি ভাল-ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন।

মুসলমানদের বঙ্গবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা' লক্ষ্য করার মত — "But it would be wrong to believe that Bakhtyar Khilji conquered the whole of Bengal". [৪৫]

এর মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতেরই অনুবর্তী। প্রবন্ধ তিনটিতে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের আলোচনা আছে।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম গ্রন্থ। বাংলার ইতিহাস চর্চা যাঁরা করেছেন তাঁরা হয় ইংরেজ না হয় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলার রাষ্ট্রীয় উত্থান - পতন এবং শাসনপদ্ধতির বিবর্তন। কিন্তু লালমোহন বিদ্যানিধি সম্পূর্ণ প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও পাশ্চাত্য ইতিহাস চর্চার সাম্প্রতিকতম শাখা অবলম্বন করেছিলেন। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' বাংলাদেশের সমাজবিন্যাস সংক্রান্ত ইতিহাস। ভারতীয় মনে সমাজবিন্যাসের বিষয় সর্বাধিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রন্থটির ইংরেজি আখ্যানপত্রে লেখা A Social History of the principal Hindu Castes in Bengal কথাটি আমাদের মনে পাশ্চাত্য প্রেরণার ধারণা দেয় এবং সেই সঙ্গে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে E.B.Cowell - এর টীকা সহ H.T.Colebrooke - এর 'Enumeration of Indian Classes' প্রবন্ধটির গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিম চন্দ্র 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থটির উচ্চ-প্রশংসা করেছেন।[৪৬]

পরিশেষে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় দুই 'ইতিহাসবেত্তা' — (১) রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং (২) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — এর কথা বলব। ইতিহাসবেত্তা হিসাবে রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত হলেও বাংলার ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গবেষণা প্রায় নেই বললেই চলে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য (বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার), তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন।"[৪৭] রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও অভিমানাহত বেদনাবোধ নিহিত আছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'On the Pala and Sena Dynasties of Bengal নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের

মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনার সূচনা করেন। পরবর্তী কালে এই প্রবন্ধটি তাঁর Indo Aryans নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে (১৮৮১) অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "পন্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাল বংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখন্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পন্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হয় নাই।" [৪৮]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সমসাময়িক কালে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের সাহায্যে পালরাজাদের বংশতালিকা ও কালনির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি পাল রাজাদের যে কালানুক্রমিক বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :-

১.	গোপাল ...	৮৫৫ খ্রিঃ
২.	ধর্মপাল ...	৮৭৫ খ্রিঃ
৩.	দেবপাল ...	৮৯৫ খ্রিঃ
৪.	প্রথম বিগ্রহপাল ...	৯১৫ খ্রিঃ
৫.	নারায়ণ পাল ...	৯৩৫ খ্রিঃ
৬.	রাজ্যপাল ...	৯৫৫ খ্রিঃ
৭.	——— পাল ...	৯৭৫ খ্রিঃ
৮.	দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ...	৯৯৫ খ্রিঃ
৯.	মহীপাল ...	১০১৫ – ১০৪০ খ্রিঃ
১০.	নয়পাল ...	১০৬০ খ্রিঃ
১১.	তৃতীয় বিগ্রহপাল ...	১০৮০ খ্রিঃ

পালরাজাদের কালনির্দেশে রাজেন্দ্রলাল অনেকখানি অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'সারনাথ লিপি' থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, মহীপালের রাজত্বকাল ১০১৫–১০৪০ খ্রিস্টাব্দে। এই ধারণা থেকে তিনি ২০ বছরে এক পুরুষ ধরে গোপালের রাজত্বকাল ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল

১০৮০ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন। কিন্তু জেনারেল কানিংহাম ২৫ বছরে এক পুরুষ ধরে গোপালের রাজত্বকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে স্থির করেছেন। বলা বাহুল্য আধুনিক গবেষণায় কানিংহামের অনুমানই সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ১০৫৫–৭০ খ্রিস্টাব্দ ধরা হয়েছে। আধুনিক গবেষণায় রাজেন্দ্রলাল প্রদত্ত পালরাজাদের নামের তালিকা মোটামুটি সমর্থিত। তবে তিনি তৃতীয় বিগ্রহপালের পরবর্তী পালরাজাদের নাম দেননি। তাঁরা হলেন — দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০–৭৫ খ্রিঃ), দ্বিতীয় শূরপাল (১০৭৫–৭৭ খ্রিঃ), রামপাল (১০৭৭–১১২০ খ্রিঃ), কুমারপাল (১১২০–২৫ খ্রিঃ), তৃতীয় গোপাল (১১২৫–৪০ খ্রিঃ), মদনপাল (১১৪০–৫ খ্রিঃ)।

পালরাজাদের মতো সেন রাজাদের কাল নির্দেশের ক্ষেত্রেও রাজেন্দ্রলাল অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি বলেছেন — **".... of the predecessors of Ballala we have lapidly proofs of four names, Vijaya Sena, Hemanta Sena, Sumanta Sena, and Vira Sena, but no authentic date about any of them. For the present their dates must be fixed by taking averages. At an average of 18 years, their reigns would extended to 944 A.D., or at 20 years, which I have relunctantly assigned to the Pala, to 986 A.D."** [৪৯]

অর্থাৎ রাজেন্দ্রলাল বীরসেনের রাজ্যাভিষেক কাল ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন এবং সেই অনুসারে সামন্ত সেন – ১০০৬ খ্রিঃ, হেমন্ত সেন – ১০২৬ খ্রিঃ, বিজয় সেন – ১০৪৬ খ্রিঃ, বল্লাল সেন — ১০৬৬ খ্রিঃ এবং লক্ষ্মণ সেন – ১১০৬ খ্রিঃ বলেছেন। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

সেন রাজাদের কালনির্ধারক বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য থাকলেও বংশতালিকা নির্ধারণে বহুলাংশে ঐকমত্য হয়েছেন। সেন রাজাদের বংশ তালিকা নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি কুলপাঞ্জিকাগুলির উপর নির্ভর না করে, শিলা–লিপি, তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক প্রভৃতি পাথুরে প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন। এই বংশের আদিরাজা আদি শূরকে নিয়ে তিনি কিছুটা বিভ্রান্তবোধ করেছেন, এবং অনুমান করেছেন

যে, সেন রাজবংশের আদিপুরুষ বীর সেন ও আদিশূর অভিন্ন হতে পারেন। কিন্তু কিংবদন্তীমূলক চরিত্র হওয়ায় রাজেন্দ্রলাল তাকে বাদ দিয়েছেন। সেনরাজারা বৈদ্য ছিলেন, এ বিশ্বাস বাংলাদেশে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল বাগখরগঞ্জ ও রাজশাহী লিপির সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করেন যে, সেন রাজারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক মন্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তার কয়েকটা উদ্ধৃত করছি। যথা —

(১) " আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রিঃ অব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।"[৫০]

(২) " মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে ভকীভূত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন।" [৫১]

(৩) " ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তারপর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। " [৫২]

পাল এবং সেনবংশীয়েরা ' এককালে এক সময়েই' রাজত্ব করতেন — বঙ্কিমচন্দ্রের এই মত গড়ে উঠেছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাল ও সেন রাজাদের কালনির্ণয়ক আলোচনা থেকে। যদিও রাজেন্দ্রলালের এই কালনির্ণয় অভ্রান্ত নয়।

বাংলা সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাঁরা করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে তাঁরা ভুলতে পারেন না। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা/১২৮২, জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত তাঁর 'বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটির গবেষণামূল্য আজও অটুট বিদ্যাপতি যে মিথিলার কবি, সে তথ্য কালনির্ণয় সহ প্রথম প্রকাশ করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আর একটি কারণে আমরা রাজকৃষ্ণবাবুকে ভুলতে পারব না, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসটি আমরা যেমন মনে রাখি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কল্যানে, তেমনি রাজকৃষ্ণের বাঙ্গালার ইতিহাসের কথা আমরা ভুলতে পারি না বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার গুণে। গ্রন্থটি সামান্য কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার গুণে তা' অসামান্য হয়ে উঠেছে। তবে অসামান্যতা নিশ্চয়ই কিছু ছিল, "নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করিনা।" ৫৩

কিন্তু, কি সেই অসামান্যতা, যার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষী গ্রন্থটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা' বিচার করে দেখতে হবে। আমরা জানি যে, স্টুয়ার্ট, মার্শ্‌-ম্যন, লেথব্রিজ রচিত বাংলার ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রকে তৃপ্ত করতে পারেনি। কারণ, এই গ্রন্থগুলিতে স্বদেশের পুরাবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাঙ্ক্ষিতরূপে ধরা দেয়নি। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইচ্ছা করলে স্বদেশের পুরাবৃত্ত উদ্ধার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা' করেন নি।

বাংলার ইতিহাসহীনতা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছিল তার অংশত উপশম ঘটিয়েছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্তত: এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দারায় আমাদের মনোদু:খ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দু:খ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মুষ্টি ভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোট ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।" ৫৪

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাজকৃষ্ণবাবুর বাংলার ইতিহাসের দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে 'অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য' তথ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ 'ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস ।'

রাজকৃষ্ণবাবুর ইতিহাসের প্রথম বৈশিষ্ট্যের সমর্থনে পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — "His little work on the History of Bengal throws a flood of light upon an unexplored region of historical research. It is a little unpretentions which more ambitious authors would hesitate to call a book, but in point of research and learning, it stands unsurpassed among the modern works on the History of Bengal." [৫৫]

বাংলার ইতিহাস স্কুলপাঠ্য পুস্তক। তার আগে স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান বাঙালীর ইতিহাস লিখেছেন। রাজকৃষ্ণবাবুর ইতিহাসে 'অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য' কথা আছে বলতে স্টুয়ার্ট , মার্শম্যান প্রভৃতি ইতিহাস রচয়িতাদের অপেক্ষা নতুন তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলা হয়েছে। 'বাংলার ইতিহাস' কোন আকর গ্রন্থ নয়। কিন্তু এটি রচনার জন্য বহু আকর গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। ইংরেজ লেখকদের রচিত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট ও সেন্সার রিপোর্ট ভিন্ন একদিকে ফা - হিয়েন, হিউয়েন সাঙের বিবরণ, আইন-ই-আকবরী, সয়ের মুতাক্ষরিণ প্রভৃতি গ্রন্থ অপরদিকে মুরের সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ফিতীবংশাবলীচরিত, মহাবংশ এবং রজনীকান্ত গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির প্রবন্ধ থেকে এ গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে।

রাজকৃষ্ণবাবু তাঁর গ্রন্থে রাজাদের নাম ও যুদ্ধতালিকার পরিবর্তে জাতি হিসাবে বাঙালির কীর্তি ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক উত্থান-পতন নয়, বাঙালি জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, স্থাপত্য ও সমাজ বিন্যাসের বিশিষ্টতার উপরেই এ গ্রন্থ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই সঙ্গে আছে বাঙালির অতীত গৌরব ও কৃতীর্যের কথা। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এটি যথার্থ সামাজিক ইতিহাস।

রাজকৃষ্ণবাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর সমালোচনা প্রকাশিত হবার পরেই কমলাকান্তের 'একটি গীত' প্রকাশিত হয়ে দেশপ্রীতির প্রবল উচ্ছ্বাসে সাহিত্যভূমি প্লাবিত করল। রাজকৃষ্ণবাবু বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করলেন না দেখে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যকে প্রবৃত্ত করার জন্য — বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করলেন। এই গ্রন্থই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্পর্কে গভীরতর গৌরবগর্ব ও অহঙ্কারের জন্ম দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বাংলার ইতিহাসহীনতার জন্য গভীর বেদনাবোধ ছিল। ইংরেজদের লেখা বাংলাদেশের ইতিহাসগুলি তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তিনি বলেছেন — " মার্শমান্, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি ; সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র।" [৫৬] তিনি মার্শম্যান্, লেথব্রিজ প্রভৃতির লেখা বাংলার ইতিহাসকে 'চুটকিতালে' 'টাকা রোজগার'-এর জন্য লেখা ইতিহাস বলে নিন্দা করেছেন। [৫৭] পক্ষান্তরে রাজকৃষ্ণবাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থকে 'সুবর্ণের মুষ্ঠি' বলে তুয়সী প্রশংসা করেছেন।

এর কারণ, প্রথমতঃ কোনো বিদেশীর পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেশ ও সমাজের প্রকৃত সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন। কি কারণে প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড় আমাদের সমাজের গভীরে অনেক বেশী দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছে তা' বোঝা কোন বিদেশীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এই কারণে — " .... অনভিজ্ঞ ইংরাজরা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পূর্ব গৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। " [৫৮]

দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন — " ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল।" [৫৯] এই কারণে তিনি বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচনা করার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষা আংশিক হলেও রাজকৃষ্ণবাবুর দ্বারা পূরণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে ইংরেজদের রচিত ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য — " আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধি ধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের

জন্ম, মৃত্যু, গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই।" ৬০

তৃতীয়তঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্বুদ্ধ শিক্ষা ও চেতনার আলোকে বাঙালির মনে যে দেশপ্রীতি ও জাতীয় গৌরববোধ জাগ্রত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র তারই আলোকে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চেয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন ছিল — "বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত।" ৬১ তাই সে ইতিহাসে স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালির 'পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি' ছিল না। তাই বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের মূলগত সাধনাটি তখন তমসাচ্ছন্ন ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন।

চতুর্থতঃ ইংরেজরা বাংলার ইতিহাস চর্চা করেছেন শাসকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দু'একজন ইউরোপীয়ের কথা বাদ দিলে তাঁদের ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সহায়তা করা। সি.এইচ.ফিলিপস্ বলেছেন- "Most of the British writers tended to give the history of British India significance in so far as it was held to teach Government some practical lessons for the future handling of affairs." ৬২

এইসব ইতিহাস বেত্তারা কখনোই স্বীকার করতে চাননি যে এদেশের এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও সুপ্রাচীন সভ্যতা ছিল। এ সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "Even when positive evidence was being brought to light about the pastgreatness of the Hindoos, there was a conscious and deliberate effort to minimize its importance. This was sought to be done in various ways. One was to deny the antiquity of Indian culture by suggesting that Indians borrowed most, if not the whole, if culture from the Greeks and where that appeared to have no basis from the Assyrians, persians, Babylonians etc." ৬৩

এর মূলে ছিল ইংরেজদের বিজয়ী মানসিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধের আধিক্য। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশী বিকৃত করে। তাহা ছাড়া এক দেশের আদর্শ আর এক দেশে খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশীর লেখনী মুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেও শুভ হয় না।"[৬৪]

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এই অশুভ প্রচেষ্টাই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। যে কারণে তিনি মন্তব্য করেছেন — "ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছু হইতে পারে না ; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই।" [৬৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর্যুক্ত মন্তব্যে অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা' নিরর্থক নয়। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় পন্ডিতদের সম্পর্কে আরও আক্রমনাত্মক মন্তব্য করেছেন — "ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পন্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাদের একথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুইচারিজন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত। তাহারা যত্ন পূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসকলে যাহা কিছু আছে — হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া — সকলই আধুনিক, আর হিন্দু গ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্যদেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমারের কাব্যের অনুকরণ ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ ডিয় হইতে প্রাপ্ত ; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া ; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচার প্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষী গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে যায় তাহাই সত্য। পান্ডবদিগের ন্যায় বীনচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পান্ডব

কবি কল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চপতি সত্য, কেন না, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চূয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গুসন সাহেব অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলা বিবস্ত্রা স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পড়িত না ; এদিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্ মিস্ত্রীর। বেবর (weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজ বুদ্ধিতে এত করে।"[৬৬]

বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের সত্যতা আংশিক হলেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের পরিমিত রূপ আমরা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের কণ্ঠেও শুনেছি। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষোভ বহুলাংশে জাতীয়তাবোধ দ্বারা চালিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতবাসীর অন্তরে দেশের অতীতকে অবলম্বন করে দেশাত্মবোধ যে আত্মশ্লাঘার জন্ম দিয়েছিল তার অনিবার্য ফল হিসাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা কিছুই পাইনি একথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যখন তাঁর অসামান্য মনীষা ও সত্যদৃষ্টির আলোকে বাংলার ইতিহাসের প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং বাংলার ইতিহাস বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন তখন তাঁকে বহুলাংশে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। বেদ, পুরাণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডঃ মূরের Sanskrit Text থেকে নিয়েছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি উইলসন এবং গোল্ডস্টুকারের মত অধিকাংশ সময় উদ্ধৃত করেছেন। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধ লেখার সময় উইলসন সম্পাদিত

Mackenzie's Collection - এর তালিকার উপর নির্ভর করেছেন। 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে তিনি 'শ্লেগেল, লাসেন, বেন্‌ফী, মোক্ষমূলর, স্পিজেল, রেণা, পিক্ত, মূর' প্রভৃতি ইউরোপীয় পন্ডিতদের মত গ্রহণ করেছেন। ডাল্‌টনের Ethnology of Bengal গ্রন্থটি তাঁর কাছে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। সুতরাং নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের দানকে অস্বীকার করা যায় না।

ইউরোপীয় পন্ডিতদের সম্পর্কে অত্যন্ত তিক্ত মন্তব্যের পরে, হেস্টির সঙ্গে বিরোধের সময়, অধিকতর পরিণত বঙ্কিমচন্দ্র তা' স্বীকার করেছেন —"No one question their scholarship, I can assure him that men like Max Muller, and Goldstucker, celebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr.Hastie. I yield to none in my profound respect for their learning, their ability, and large - hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuit from which my countrymen often recoil in fear and despair. And I, as a native of India would be certainly shamefully wanting in gratitude, if I did not acknowledge their great services in the dissemination of the Sanskrit language and learning throughout the civilized world." [৬৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের মধ্যে যে সুবিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা' উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে নবজাগ্রত স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির কারণে বাঙালি যেমন একদিকে ইউরোপীয়দের প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করেছে তেমনি অপর দিকে জ্ঞানানুশীলনের প্রতি প্রদর্শন করেছে শ্রদ্ধা। এই বিদ্বেষ ও শ্রদ্ধাই যুগপৎ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে যে সত্যানুসন্ধিৎসার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তাই পরবর্তীকালে স্বদেশ, স্বজাতি ও ইতিহাসপ্রীতির সহযোগে তাঁকে সত্যানুসন্ধিৎসার সাধনায় নিমগ্ন করেছে।

।। সূত্র – নির্দেশ ।।

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভারত-কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ২৩৪।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – কাদম্বরী, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খন্ড), ১৯৬৭, পৃঃ ৫৩৭।

৩। A. A. Macdonel – A History of Sanskrit Literature, 1971, p. 8.

৪। R. C. Majumder – Ideas of History in Sanskrit Literature, Ed. by C. H. Philips-Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1961, p. 13.

৫। বিজন বিহারী গোস্বামী (অনুঃ ও সম্পাঃ) – অথর্ববেদ-সংহিতা, ১৫শ কান্ড, ১ম অনুবাক, ৬ষ্ঠ সূক্ত, ১১শ শ্লোক, ১৯৭৮, পৃঃ ৪৪৭।

৬। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস – মহাভারতম্ আদিপর্ব, অনুক্রমণিকাধ্যায়, ১৬ শ্লোক, অনুঃ ও সম্পাঃ - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ১৩৩৮, পৃঃ ১২।

৭। নলিনী নাথ রায় (অনুঃও সম্পাঃ) - ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭ম প্রপাঠক, ১ম খন্ড, ৪র্থ শ্লোক, ১৩৯৫, পৃঃ ৬০৯।

৮। Kautilya – Arthashastra Trn. & Ed. Raghu Nath Singh, 1983, p. 62.

৯। R. C. Majumder – Ibid, p. 14.

১০। Kalhana – Rajtarangini, Trn. & Ed. Vishva Bandhu, 1963, p. 4.

১১। R. C. Majumder – Ibid, p. 21.

১২। A.A.Macdonel – Ibid, p.9.

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – শিবাজী ও মারাঠা জাতি, ইতিহাস, (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত), ১৩৬৮, পৃঃ ৫৬।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য়খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৩।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

১৭। সুকুমার সেন – ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৬৬, পৃঃ ৩৪০।

১৮। প্রবোধচন্দ্র সেন – বাঙ্গার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ৪৪।

১৯। Jadu Nath Sarkar – History of Bengal, Vol.II, 1948,p.49.

২০। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য়খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

২১। Syed Gholam Hossein – Seir-Mutaqherin, Trn. by M.Raymond, 1902, p.25.

২২। Ibid, p.23-24.

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

২৪। যদুনাথ সরকার – মধ্যযুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের মশলা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৭ সন, পৃঃ ২৩৩।

২৫। Ghulam Husain Salim — Riyazu-s-Salatin
Trn. by Maulavi Abdus Salam, 1904, p.414.

২৬। যদুনাথ সরকার — প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

২৭। Sibdas Chaudhuri (Com. & ed.) — Proceedings of the Asiatick Society, Vol.I, (1784-1800), 1980, p.2.

২৮। William Jones — Discourse, Asiatic Researches, Vol.I, 1979 (Reprint), p.x.

২৯। Sibdas Chaudhuri — Ibid, p.6.

৩০। Ibid, p.77.

৩১। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় — 'ভূমিকা', গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত 'বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক', ১৯৬৫, পৃঃ-৭

৩২। H.T.Colebrooke — Inscription on a plate of copper found in the district DINAJPUR, Asiatick Researches, Vol.IX, 1979, (Reprint), p.443.

৩৩। H.T.Colebrooke — Enumeration of Indian Classes, Asiatick Researches, Vol.VI, 1979 (Reprint), p.53.

৩৪। Rajendralal Mitra — History of the Society, Centenary Review of the Asiatick Society of Bengal, Vol.I, 1884, p.65.

৩৫। প্রবোধ চন্দ্র সেন — বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ১৬—১৭।

৩৬। Charles Stewart — History of Bengal, Preliminary Discourse, 1904 (Bangabasi), p.vii.

৩৭। Ibid, p.ii.

৩৮। Ibid, p.viii-ix.

৩৯। Ibid, p.vi.

৪০। Ibid, p.ix.

৪১। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৬।

৪২। Charles Stewart — History of Bengal, Preface, 1904,p.l.

৪৩। John Clark Marshman — History of Bengal, 1846,p.i.

৪৪। H.Blochmann — Contributions of the Geography and history of Bengal (Muhammedan period), 1968 (Reprint), p.i.

৪৫। Ibid, p.3.

৪৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩২২।

৪৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য়খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩১।

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৬।

৪৯। Rajendralal Mitra — On the Pala and Sena Dynasties of Bengal, Indo Aryan, Vol.II,1881, p.258.

৫০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩২৪।

৫১। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৮।

৫২। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৪।

৫৩। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩১।

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩১।

৫৫। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — উদ্ধৃতি, ভবতোষ দত্ত - সুবর্ণের মুষ্ঠি, বঙ্কিম ভাবনালোক, ১৯৮৮, পৃঃ ৬২।

৫৬। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩০।

৫৭। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৬।

৫৮। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৫।

৫৯। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

৬০। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৬।

৬১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ, ইতিহাস (পুলিন বিহারী সেন ও প্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত) ১৩৬৮, পৃ: ১১৮।

৬২। C.H.Philips (ed.) – Editor's Introduction, Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1967, p.8.

৬৩। R.C.Majumder – Quoted by R.K.Dasgupta, Macaulay's Writings on India, in C.H.Philips (ed.) - Historians of India,Pakistan and Ceylon, 1967, p.236.

৬৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ঐতিহাসিক চিত্র, ইতিহাস, (পুলিন বিহারী সেন ও প্রবোধ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত), ১৩৬৮, পৃ: ১৪০।

৬৫। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দ্রৌপদী, দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ১৯৭।

৬৬। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৪০৯–১০।

৬৭। Bankim Chandra Chatterjee – Letter in the Hastie Controversy, The Statesman, October 16,1882, Bankim Rachanavali (Vol.III), 1969, p.205.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সত্যানুসন্ধিৎসার সাধনা

উনিশ শতকে, চিন্তার জগতে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে থেকেই, বাঙালি মনীষার চিন্তার জগৎ ছিল বিস্তীর্ণ। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ চিন্তার জগতের মধ্যে একটি ঐক্য ছিল — তা' হল ইহ চেতনার প্রাধান্য। এই ইহ চেতনার পথ ধরেই এসেছিল ইতিহাস চেতনা। যদিও সে চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচেতনা নয়; তবু সাধারণ ইতিহাস চেতনার পথ ধরেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচেতনার জন্ম। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচেতনাকে বুঝতে হলে আমাদের সে সাধারণ ইতিহাস-চেতনার প্রাথমিক স্পন্দনকে অনুধাবন করতে হবে।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের আগেই, হিন্দু—কলেজের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নব—শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তার ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে কাব্য ও দর্শনের সঙ্গে ইতিহাসের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেন। বিশেষ করে ইতিহাস তাঁদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। " তখনও তাঁদের কোন স্থায়ী জীবনাদর্শ গড়ে ওঠেনি বলে প্রকৃতির নিয়মের মতো ইতিহাসের নীতিই ছিল তাঁদের একমাত্র নীতি।" [১]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট বেন্টিঙ্ক কর্তৃক 'মেকলে মিনিট'[২] গৃহীত হলে বাংলাদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। এই সময় বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্য হয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলার ইতিহাস রচিত হতে থাকে।[৩] এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের History of Bengal গ্রন্থটি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটির একাধিক বঙ্গানুবাদও হয়।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে, যে বছর বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সে বছরই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisation of General knowledge) স্থাপিত হয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ চন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি 'ইয়ং — বেঙ্গল —এর

দল এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা এই সভায় যে সব বিষয়ের আলোচনা করতেন, যে সব প্রবন্ধ পাঠ করতেন, তাতে ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তাঁদের অনেক প্রবন্ধ 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'এনকোয়ারার', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ হল — কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'On the Nature and Importance of the Study of History', প্যারিচাদ মিত্রের 'The States of Hindoostan Under the Hindoos', 'The zeminder and the Ryot', গোবিন্দ চন্দ্র সেনের 'Brief outline of the History of Hindoostan'. এইসব প্রবন্ধ নব্যশিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা সঞ্চারে সহায়তা করেছিল।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলন্ড থেকে স্বদেশে ফেরার সময় ইংলন্ডের ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের নেতা জর্জ টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। টমসন বাংলাদেশের তরুণদের স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা ভালভাবে জানতে উৎসাহিত করেন। টমসনের অভিপ্রায়কে চরিতার্থ করে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্যারিচাঁদ মিত্রের **'The Zeminder and the Ryot'**. প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা ছিল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শকে অনুসরণ করেছেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ থেকে **'Highest proficiency in all subjects'** প্রদর্শন করেন। পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নম্বর ছিল নিম্নরূপ:-

Literature - 55, History - 82, Mathematics - 67.5,
Natural Philosophy - 74.3, Translation - 76,
Total - 354.8.[8]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক।

অন্তরে বঙ্গপ্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে থাকতে পারে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার 'বঙ্গদর্শন' নামকরণের মধ্যেই তাঁর বঙ্গ-প্রীতির পরিচয় লুকিয়ে আছে। 'বঙ্গদর্শন' - এর মধ্যে তিনি বঙ্গের সমগ্র রূপকে ধরতে চেয়েছেন। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য লিখেছেন — " শুধু বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চার জন্য নয়, বাংলা দেশকে জানব বুঝব আবিষ্কার করব, মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করব — তাই পত্রিকার নাম বঙ্গদর্শন।" [১১]

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা শুধুমাত্র সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন নি। কি কারণে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হল তা' 'পত্রসূচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্ত করে বলেছিলেন — " আরও অনেক কাজ করিব, বাসনা করি।" [১২] কিন্তু, আরও অনেক কাজ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তার ব্যাখ্যা 'পত্রসূচনা'য় নেই। ডঃ সত্যনারায়ণ দাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বিভিন্ন বর্ষের সূচীপত্রের বিশ্লেষণ করে বিষয়টি অনুমান করেছেন। সে অনুমানের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল — " .... সম্ভব হলে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা — অন্যথায় সে ইতিহাস রচনায় বঙ্গবাসীকে অনুপ্রাণিত করা, জাতির মধ্যে ইতিহাস চেতনার সঞ্চার করা ; .... জাতিচিত্তে জাতীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা উৎপাদন ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করা — তদানীন্তন আবেগ-সঞ্চালিত জাতীয়তা-বোধের পরিবর্তে জাতিকে আবেগ বর্জিত উন্নয়নমূলক স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা ; .... দেশের অতীত সংস্কৃতি দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতাবোধ জাগানো এবং এভাবে দেশবাসীর হীনমন্যতা দূর করা ; ....।" [১৩]

বঙ্গদর্শনের অনেক ভাবনা ও বাসনার মধ্যে অন্যতম একটি ছিল স্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার। এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির অন্তরে ইতিহাস-তৃষ্ণা জাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, বাংলার ইতিহাস বাঙালির দ্বারা বাংলা ভাষায় রচিত হোক। বিমলা প্রসাদ মুখার্জী বলেছেন — "Bankim Chandra Chatterji, ... was however responsible for a drive in reconstructing the history of Bengal. His famous journal Bangadarshan become a

forum where the elite of Bengal met and discussed the problems of cultural history .... he was a social thinker who stressed the need for history, for knowing it and writing it in our mothertongue."[১৪]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন — " তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান।" [১৫] বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন যে — " এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব।" [১৬] কিন্তু নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবে অন্যকে এ কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য তিনি বাংলার ইতিহাস বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হল :—

১।	বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — প্রথম প্রস্তাব	(বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০)
২।	বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব	(বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২)
৩।	বাঙ্গালার ইতিহাস	(বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১২৮১)
৪।	বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	(বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭)
৫।	বাঙ্গালীর উৎপত্তি	(বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ পর্যন্ত ছ'টি সংখ্যায় প্রকাশিত।)
৬।	বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ	(বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯)
৭।	মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়	(বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১২৮৯)[১৭]
৮।	বাঙ্গালার কলঙ্ক	(প্রচার, শ্রাবণ, ১২৯১)

এছাড়া 'বঙ্গদেশের কৃষক' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুণ, ১২৭৯) প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ না হলেও এতে গভীর ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় আছে এবং 'বাঙ্গালীর বাহুবল' (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১২৮১) প্রবন্ধটি বঙ্গপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে রচিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নৃ-তত্ত্ব, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত — এই তিনটি দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলি একদা সত্যানুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি ও দেশপ্রীতির আবেগ সহকারে ইতিহাসবিহীন বাঙালি জাতির কাছে ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শনের কাজ করেছে।

ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক কথা জাতিতত্ত্ব আলোচনা। বাংলাদেশে জাতিতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করেন এইচ.টি.কোলব্রুক। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে Asiatic Researches (Vol.I, p.52-67) পত্রিকায় তাঁর 'Enumeration of Indian Classes' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তবে " বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষায় জাতিতত্ত্ব আলোচনারও গুরু, কেননা তাঁহার প্রথম প্রস্তাব (বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার) লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।" [১৮]

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – প্রথম প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে আর্যজাতির আগমন কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রস্তাবের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় পন্ডিতদের এ মত স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আর্যরা ইরাণ বা তৎসন্নিহিত কোন অঞ্চল থেকে ভারতে আসেন। প্রথমে তাঁরা পাঞ্জাবে আসেন এবং পরে পূর্বদেশ অধিকার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে — " এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌন্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশ মধ্যে কলিকাতা, বর্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসন্ কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুন্ড্র হইতে একটি পৃথক রাজ্য ছিল। এক্ষণে বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলকেই 'বঙ্গদেশ' বলে—

সেই প্রদেশকেই প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড্র, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্বে আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজ রাজা, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন।" [১৯] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন যে, আর্যরা প্রাচীন 'বঙ্গদেশে' আসার আগে পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আধুনিক 'বঙ্গদেশের' প্রধানাংশ আগে 'পৌণ্ড্রদেশ' বলে পরিচিত ছিল এবং আধুনিক মালদহের অন্তর্গত পান্ডুয়া নামক অঞ্চল হল পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সমুদ্রতীর থেকে পদ্মাতীর পর্যন্ত অঞ্চলে অনেক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাদের 'পৌণ্ড্রদিগের বংশ' বিবেচনা করেছেন এবং অনুমান করেছেন যে, পুঁড়া ও পোদ শব্দ দু'টি পুণ্ড্রশব্দের অপভ্রংশ। মহাভারতকার পুণ্ড্রদের অনার্যজাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলেও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শতপথ ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, কোনো প্রাচীন গ্রন্থেই বাংলাদেশে আর্যজাতির বসবাসের উল্লেখ নেই। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে — "যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এদেশে আর্য্য জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্‌খানি কোন্ কালে সঙ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এদেশ (বঙ্গদেশ) ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি।" [২০]

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — প্রথম প্রস্তাবের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন — "এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব।" [২১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'অবকাশ' হয় দীর্ঘ দু'বছর পরে। লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত' "সম্বন্ধ-নির্ণয়" (১৮৭৫) গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষ্যে রচিত 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব'-এ।

আলোচনার সূচনাতেই 'সম্বন্ধ - নির্ণয়' গ্রন্থটির প্রশংসা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — " পন্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত ; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত ; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত।" [২২] 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থটি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক নয়। কায়স্থ ও বৈদ্যদের ইতিবৃত্তও এতে সংগৃহীত হয়েছে। তবে ব্রাহ্মণদের বিবরণ এখানে বিশেষভাবে পর্যালোচিত হয়েছে এবং অন্য জাতির ইতিহাস সে আলোচনার আনুসঙ্গিক হিসাবে এসেছে মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থে অত্যন্ত পরিশ্রম করে প্রভূত প্রমাণ বা বিষয় সন্নিবিষ্ট করেছেন, যা সাধারণত কোনো বাঙালি লেখক করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র এই সব প্রমাণ বা বিষয়ের উপর নির্ভর করেই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যেহেতু গ্রন্থটি ত্রুটিশূন্য নয়, তাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত সত্য নির্ধারণের জন্য স্বকীয় বিচার এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তের সহায়তা নিয়েছেন।

ভারতীয় আর্যজাতি চতুর্বর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রকৃত আর্যজাতি। শূদ্র অনার্য জাতি। বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় আসেনি, বৈশ্য কদাচিৎ বাণিজ্যার্থে এসেছে। বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নেই, আছে শুধু ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণেরা চিরকাল বাংলাদেশে বসবাসকারী ছিলেন না। আদিশূর ১৪২ খ্রিস্টাব্দে কান্যকুব্জ থেকে

পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনার আগে বাংলাদেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসার দেড়শ' বছর পরে বল্লাল সেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা চালু করেন। ঐ দেড়শ' বছরে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এগারশ' ঘরে পরিণত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় – "খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্যভূমি ছিল।" [২৩] কারণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, প্রাচীন আর্যজাতি যেখানে বাস করেছেন সেখানেই ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের চিহ্ন স্বরূপ নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর আগে কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। কল্লভট্ট, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য প্রভৃতি সকলেই আদিশূরের পরবর্তীকালের এবং ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁর সমসাময়িক কালের গ্রন্থকার। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অষ্টম শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ছিল না, বা থাকলেও তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল।

এই প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে যা বলেছেন কায়স্থদের সম্পর্কেও সেই একই কথা বলতে চেয়েছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থদের সৎশূদ্র বললেও বঙ্কিম-চন্দ্রের মতে তারা বর্ণশঙ্কর এবং সে কারণেই আর্যবংশসম্ভূত। আদিশূরের সময় পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার আগে বাংলায় যেমন ব্রাহ্মণেরা ছিলেন তেমনি কায়স্থরাও ছিলেন, কিন্তু অল্প সংখ্যক।

উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির মনে যে আর্যগৌরব বোধ জাগ্রত হয়েছিল স্বাভা-বিক কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – দ্বিতীয় প্রস্তাব'–এ বঙ্কিমচন্দ্র যা সপ্রমাণ করতে চাইলেন তাতে আধুনিক ইংরেজদের সামনে প্রাচীন সভ্য জাতি হিসাবে বাঙালির স্পর্ধা করার ক্ষমতা কিঞ্চিত লঘু হয়ে পড়ল। বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই মন্তব্য করতে হল — " আমরা দেখিতেছি না যে অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম – বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই — আর্যকীর্তিভূমি উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা যে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী।

সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্বপুরুষ।" [২৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তুর্কী আক্রমণের সময় আর্যরা এদেশে ঔপনিবেশিক শক্তি মাত্র এবং তখনও বঙ্গীয় আর্যদের অভ্যুদয়ের সময় আসেনি, সে কারণে, সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গজয় কনৌজ আর্যদের ক্ষেত্রে নঘু করে দেখা যেতে পারে। তাঁর মতে এখন (উনিশ শতক) সে অভ্যুদয়ের সময় উপস্থিত। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, বাঙালি জাতি অচিরে পৃথিবীর মধ্যে যশস্বী হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষার কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও আমাদের জানিয়েছেন। — " 'রিনাইসেন্স' (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও আবার যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।" [২৫] বঙ্কিমচন্দ্রের এ আশা ব্যর্থ হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ মধ্যেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বাঙালির আবির্ভাব হয়েছে।

তবে 'খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি ছিল' বঙ্কিমচন্দ্রের এ মত সঠিক নয়। কারণ, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই আর্যরা নানা কারণে বাংলাদেশে আসতে এবং বসবাস করতে শুরু করেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে অগণিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ; বিভিন্ন তাম্রশাসনেও তার উল্লেখ আছে। [২৬]

এছাড়া গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করার জন্য কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনেন এবং পরবর্তীকালে আগত বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সব ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ থেকে আসা পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সন্তান — এমত গ্রহণযোগ্য নয়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারও এমত গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তবে 'সম্বন্ধ নির্ণয়' প্রণেতা যখন এমত প্রকাশ করেন তখন এমত " রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বিশ্বাস করিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রও বিশ্বাস করিতেন।" [২৭]

বাঙ্গালার ইতিহাস

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' পুস্তকের আলোচনা উপলক্ষে রচিত। আলোচনার সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বেদনাহত কণ্ঠে বলেছেন — "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনলন্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত, গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।"[২৮]

ভারতবর্ষের ইতিহাসহীনতার কারণের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসহীনতার কারণকে বঙ্কিমচন্দ্র একত্রিত করে দেখেছেন। তাঁর মতে এই ইতিহাসহীনতার কারণ প্রধানত দুটি — (১) ঘোরতর দেবভক্তি, (২) অত্যন্ত দৈবপ্রীতি। অত্যন্ত বিনীত মানসিকতার কারণে প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাসহীন। পক্ষান্তরে জাতীয় গৌরবের গর্ব হেতু ইউরোপীয়দের ইতিহাসের বাহুল্য।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য ও নতুন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :-

প্রথম। বাঙালি জাতি 'ঔপনিবেশিকতায়' এথেনীয়দের তুল্য ছিল। ভারতবর্ষের আর কোনো জাতি এমন 'ঔপনিবেশিকতা' দেখাতে পারেনি। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে বাঙালি উপনিবেশ বিস্তার করেছিল এবং সিংহল বাঙালি কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। যদিও বাঙালির সিংহল বিজয় নিয়ে বিতর্ক আছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় কাহিনীকে কাল্পনিক বলেছেন।[২৯]

দ্বিতীয়। বাঙালি রাজারা অনেক সময় উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশের দেবপাল দেব ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট বলে কীর্তিত। লক্ষ্মণ সেন, বারাণসী, প্রয়াগ এবং শ্রীক্ষেত্র জয় করেছিলেন। বাঙালিরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছেন। এ সব থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে বাঙালি গৌরবহীন

ও ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হয়েছিল — এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপ রাজপুরী বিজিত হয়েছিল। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী ও তার সঙ্গী পাঠান সৈন্যরা নবদ্বীপ জয় করেছিল মাত্র। তারা কখনোই বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করতে পারেনি।[৩০] নবদ্বীপ জয়ের পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেনবংশীয়রা পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার অধিপতি থেকে স্বাধীন ভাবে সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করেছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী যে মিথ্যা, এমত সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকাশ করেছেন, আধুনিক কালে এ মত ঐতিহাসিক গবেষণায় সমর্থিত। [৩১]

চতুর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাঠান রাজত্বকালে বাংলাদেশ ছিল 'স্বতন্ত্র ও স্বাধীন'। এ কারণে পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সে দুর্দশা ঘটেনি। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল এই যে, এতে জাতির মানসিক স্ফূর্তি নির্বাপিত হয়, কিন্তু পাঠান রাজত্বকালে বাঙালির মানসিক স্ফূর্তি সর্বাপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হয়েছিল। হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা ঐশ্বর্যপূর্ণ দেশ ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় বিদ্যাপতি [৩২] ও চণ্ডীদাস, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব, বৈষ্ণব গোস্বামীবৃন্দ আবির্ভূত এবং তাঁদের গ্রন্থাবলী রচিত। আধুনিক কালেও এই যুগকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী আমলে বাঙালির বিদ্যাচর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য শিল্প-কলা ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল।

পঞ্চম। পাঠান রাজ বাংলার মিত্র আর মোঘল বাংলার শত্রু। কারণ, মোঘল আমলেই বাংলার শ্রীহানি এবং বাঙালির অধঃপতনের সূচনা হয়। এই সময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা হারিয়ে করদ রাজ্যে পরিণত এবং বাংলার ধন বাংলায় না থেকে দিল্লীর পথে চালিত হয়। মোগলের সব কীর্তি উত্তর ভারতে, বাংলায় মোঘলের কোন কীর্তি নেই। উত্তর ভারতের কীর্তির অর্থও বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত। এ সময়ে বাঙালি জাতির মানসিক স্ফূর্তি নির্বাপিত হয়েছিল, ফলে কোনো ভাল কবি ও শাস্ত্রবেত্তার আবির্ভাব হয়নি বা কোনো ভাল গ্রন্থ রচিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাঙালির 'মানসিক উদ্দীপ্তি'র কারণে পাঠান শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, তেমনি সেই রেনেশাঁসের আলোক নির্বাপিত হওয়ার কারণেই মোঘল শাসনের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসবিদ্ তপন রায় চৌধুরীর রচনায়। তাঁর মতে — "Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The Viceroys and Officers came and went without taking any real interest in the life of the province. A considerable part of the resources of the land was drained away to upper India in the form of presents or cash tributes." ৩৩ এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ড: ভবতোষ দত্ত যথার্থই বলেছেন — "বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সারবত্তা আমরা বুঝতে পারি যখন ভেবে দেখি মোঘল শাসনে সত্যই বাঙালীর মনের ক্ষেত্রে কোন নবীন শস্য জন্মেনি; শুধু পূর্বে উদ্ভাবিত শস্যের বীজ বপন করে যাওয়া হয়েছে মাত্র। পূর্ববর্তী কাব্যের আদর্শের অনুসরণে বহিরঙ্গ - পরিপাট্যে মনোহর করে মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের দুই ধারা চলে আসে। ধর্মের দিক দিয়েও বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে শক্তিধর্মের প্রান্তরে পথ হারায়।" ৩৪

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধের সূচনায় বাঙালির ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল বঙ্কিমচন্দ্র বেদনাহত কণ্ঠে বলেছেন — "যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুন:প্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম্ ও ওয়াটার্লু — ইতালি অধ:পতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়, — হায় ! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই ?" ৩৫

বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বাঙালি জাতি একদিন তার লুপ্ত আত্ম-চেতনা ও প্রাচীন গৌরববোধ নিয়ে পুনরায় জেগে উঠবে। এই জাগরণের জন্য প্রয়োজন জাতির ইতিহাস। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র আর্তকণ্ঠে বলেছেন — "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে — মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল — অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না — চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"[৩৬] রবীন্দ্রনাথও একই ভাবে বলেছেন — "ইংরাজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়াছে ; সেও নিজেকে রণগৌরব, ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ অধিকার ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন নাই। .... তাঁহারা কি করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কি করিব তাহাও জানি না।"[৩৭]

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য জাতি নয়, এবং সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য, বাঙালি যদি চিরকাল দুর্বল, অসার ও গৌরবশূন্য হত, "তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধর্ম ; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায় ; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের কোথা হইতে আসিল ? দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরওত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে ? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে ?"[৩৮]

বাঙ্গালার ইতিহাসের সেই 'সার কথা' ইংরেজ অথবা মুসলমানের ইতিহাসে পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র মিন্‌হাজ-উদ্-দীন কথিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সপ্তদশ

অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ে কাহিনী মিথ্যা। কারণ, সতের জন অশ্বারোহী মিলে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে বিজিত করল, এ কাহিনী প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এবং "আরিস্টটল হইতে মিল পর্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। .... বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।"[১৯] এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়' প্রবন্ধে।

'বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা' ছিল, কিন্তু ইতিহাস ছিল না। বাঙালি কর্তৃক বাঙ্গলার ইতিহাস রচিত হয়নি ; তাই বাংলার প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র চাইতেন যে, বাঙালি কর্তৃক বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচিত হোক। এই কারণে তিনি সকল বাঙালিকে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। অনেকে বুঝতে পারেন না যে, কোন্ পথে, কি ভাবে অনুসন্ধান করে ইতিহাস রচনা করতে হবে ; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের জন্য বাঙ্গলার ইতিহাস রচনার একটি পথ নির্দেশিকা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথিত বাংলার ইতিহাস রচনার পথনির্দেশিকাকে আমরা নিম্নরূপে সাজাতে পারি :-

১। বাঙালি জাতির উৎপত্তি বিচার।

২। বাংলায় আর্য অধিকার বিস্তারের ইতিবৃত্ত।

৩। আদিশূরের আগে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র।

৪। পাল ও সেন রাজ্য একত্রীকৃত হওয়ার ইতিবৃত্ত।

৫। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত 'এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের' অবস্থা ; রাজ্যশাসন, শান্তিরক্ষা, সামরিক শক্তি, জন প্রশাসন, রাজস্ব-পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা, ধর্ম ও দর্শন চর্চা, শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা, মহৎ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচয়, বাঙালির চরিত্রের উপর ঐ সব গ্রন্থের প্রভাব, সামাজিক পরিচয়, বিবাহ পদ্ধতি, বর্ণব্যবস্থা, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, সমুদ্র যাত্রা পদ্ধতি, উপনিবেশ বিস্তার, আমদানি - রফতানি ও পণ্যসামগ্রীর বৃত্তান্ত।

৬। বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান অভিযান। মুসলমানেরা কি ভাবে, বাঙ্গলাদেশের কতটুকু অধিকার করেছিল।

৭। বাংলাদেশে পাঠান শাসন ও তার বিশেষত্ব। হিন্দু রাজারা পাঠান রাজত্বে কার্যত স্বতন্ত্র ছিলেন। এই সব ছোট ছোট রাজ্য ও রাজবংশের ইতিহাস রচনা।

৮। ইউরোপের রেনেশাঁসের মত ষোড়শ শতকে বাংলা দেশেও একবার 'নবজাগরণ' হয়েছিল। এই নবজাগরণের প্রেরণা ও স্বরূপ অনুসন্ধান। এই 'মানসিক উদ্দিপ্তী' নির্বাপিত হবার কারণ অনুসন্ধান।

৯। বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস।

১০। পরিশেষে মোঘল শাসন — মোঘল শাসনের কুফল, তোডরমল্লের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া, মুর্শিদকুলি খাঁর সংস্কার, জমিদারী ব্যবস্থার উদ্ভব এবং মোঘল সাম্রাজ্যে তাদের অবস্থার সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের এবং উনিশ শতকের জমিদারদের অবস্থার তুলনা।

১১। দেশীয় লোকের স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্মগ্রহণ বাংলার ইতিহাসের এক গুরুতর তত্ত্ব। কোন্ শ্রেণীর মানুষ কোন্ সময়ে ধর্মান্তরিত হল এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্য শুধুমাত্র পথ-নির্দেশ করেই তাঁর কর্তব্য সমাপন করেন নি। তিনি স্বয়ং সেই পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশের ইতিহাস উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিহাসের গোড়ার কথা জাতিতত্ত্ব। যে জাতির ইতিহাস আলোচিত হবে সে জাতির সঙ্গে অপরাপর কোন্ কোন্ জাতির মিশ্রন হয়েছে, বংশানুক্রমে তারা কিরূপ আকৃতি ও প্রকৃতির উত্তরাধিকারী তার আলোচনা ইতিহাসের প্রথম ভাগের বিষয়। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জাতির উৎপত্তি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত এই জাতিবিভাগ করা হত ভাষাবিভাগ অনুসারে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বাঙালির উৎপত্তি বিচারে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে আশ্রয় করেছেন। তাঁর মতে — "কে আর্য্য, কে অনার্য্য ? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায়, ...। যাহার ভাষা আর্য্যজাতীয় ভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্য্যভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয় ....।" [৪০] এই সাধারণ বিচারে বাংলাভাষা আর্য-ভাষা হওয়ায় বাঙালি জাতিকে আর্যজাতি বলা যায়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে — "বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে।" [৪১] কারণ, এমন অনেক দেখা গেছে যে, কোনো কোনো জাতির ভাষা এক জাতীয় বংশ অন্য জাতীয়। এর কারণ, অনেক সময় বিজিত জাতি বিজয়ী জাতির ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করে বিজয়ী জাতিভুক্ত হয়েছে। " এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, কিন্তু ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেল্‌টীয় শোণিতে-নির্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিন ভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন গল্‌দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশ বর্তমানে ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পর্টুগল্) ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফ্‌রি দাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব ভাষা আর্য্যভাষা হইলেই আর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না — অন্য প্রমাণ আবশ্যক।" [৪২]

'অন্য প্রমাণ'-এর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ভিন্ন শারীরিক গঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর এই গুরুত্ব আরোপকে আমরা তখনই গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারি, যখন তিনি বলেন — "সকলেই জানে যে, আর্য্যেরা ককেশীয়বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্য্য ভিন্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ — গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হনুদ্বয় অনুন্নত। মোঙ্গলবংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক্। মোঙ্গলীয়েরা খর্বাকার, মস্তকের

গঠন চতুষ্কোণ, হনূদ্বয় অত্যুন্নত। যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আর্য্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্য্যভাষা, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা আদৌ অনার্যজাতি, আর্য্যদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার যদি দেখি যে, সেই অনার্য্যজাতি কেবল আর্য্যভাষা নহে, আর্য্যধর্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে – তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য্য উন্নত – অনার্য্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আর্য্যেরা জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়াছে।"[৪৩]

এছাড়া আর্য-শূদ্রদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন –"প্রথম, কে আর্য্য আর কে অনার্য্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালী শূদ্রই আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আর্য্যপ্রকৃত। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগুলি শূদ্র আর্য্যবংশীয়।"[৪৪]

আর্য আগমনের আগে বাংলাদেশে প্রথমে কোলবংশীয় অনার্যরা বসবাস করত, পরে দ্রাবিড়বংশীয় অনার্যরাও বসবাস শুরু করে। আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের একাংশ অরণ্য ও পর্বতে পালিয়ে যায় আর অপরাংশ আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে, আর্যভাষা ও আর্যধর্ম গ্রহণ করে ক্রমে হিন্দুজাতি বলে গণ্য হয়। অনার্যজাতি যে নিজেদের অনার্যভাষা পরিত্যাগ করে আর্যভাষা ও আর্যধর্ম গ্রহণ করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন – হাজারিবাগ প্রদেশের 'বিদয়' জাতি, আসামের হিন্দু 'চুটীয়া' এবং 'কাছাড়িয়া', কোচবিহারের 'কোচ' জাতি, ত্রিপুরার পাহাড়ী অধিবাসী ইত্যাদি। এই সব তথ্য বঙ্কিমচন্দ্র Statistical Account of Bengal এবং

Dalton's Ethnology থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার লোকগণনা থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান, – এরা বাঙালি বটে কিন্তু আর্য নয়। বাংলা দেশের অসংখ্য নিম্নবর্ণের মানুষ – হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওড়া, কৈবর্ত, জেলে, কোঁচ, পলি প্রভৃতি – এরাও আর্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য্য সন্দেহ নাই; কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে ঐরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্প সংখ্যক বৈদ্য ও বণিক্‌গণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।"[৪৫] তবে ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং শূদ্রদের মধ্যে কিছু আর্যজাতীয় হলেও অধিকাংশ অনার্যজাতীয়।

বাঙালির উৎপত্তি বিচার করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্থূল কথা আমাদের জানিয়েছেন, তা'হল – "প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাক্‌সন্, ডেন্ ও নর্মান মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালীর গঠনে .... বিশেষ প্রভেদ আছে। — ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি।"[৪৬] সাক্‌সন্, ডেন্ ও নর্মান এই তিন জাতিই আর্যবংশীয় হওয়ায় এবং বিবাহাদির দ্বারা সম্পর্ক যুক্ত হয়ে পার্থক্য লুপ্ত হওয়ায় ইংরেজ এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় আর্যদের ধর্ম, বর্ণ ও আকারগত পার্থক্য থাকায় বাংলায় তিনটি জাতির পৃথক স্রোত মিলে মিশে একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক কালে বাঙালির মধ্যে চারটি জাতি লক্ষ্য করেছেন – (১) আর্য (২) অনার্য হিন্দু (৩) আর্যানার্য হিন্দু (৪) মুসলমান। এই চার ভাগ পরস্পর থেকে পৃথক পৃথক থাকে। বাঙালি জাতির উচ্চস্তরে শুধু আর্য। কিন্তু নিম্নস্তরে, যেখানে অধিকাংশ বাঙালি, সেখানে অনার্য, মিশ্রিত আর্য ও মুসলমান। তবে উপরের স্তরে প্রায় অমিশ্রিত আর্য থাকার ফলে দূর থেকে বাঙালি জাতিকে আর্য জাতি বলে বোধ হয়।

বাঙালির উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তারপর নতুন নতুন গবেষণার দ্বারা আরও অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪৭] কিন্তু, বাঙালি মিশ্রজাতি বা বহুজাতি সঙ্কর – বঙ্কিমচন্দ্রের এ অভিমত আজও মূল্য-হীন বলে প্রতিপন্ন হয়নি। তবে, ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত আর্য – বঙ্কিমচন্দ্রে এ অভিমত আধুনিক নৃ-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন না। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন – "বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তাহারা যে বৈদিক আর্যগণ হইতে ভিন্নজাতীয় ছিলেন, এ বিষয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ নাই।"[৪৮]

বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ভাষাভেদে জাতিভেদ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বাঙালির উৎপত্তি বিচার করলেও এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পক্ষান্তরে আকৃতি-ভেদে জাতিভেদ তত্ত্বও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। কারণ, অনেক সময় বংশানুগত না হয়ে আবহাওয়ার প্রভাবে আকৃতির রূপান্তর হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য প্রতিভাবলে দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালির উৎপত্তি বিচার করেছেন। বাঙালির উৎপত্তি বিচার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের উচ্চ প্রশংসা করে বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও নৃ-তত্ত্ববিদ রমপ্রসাদ চন্দ বলেছেন – "জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁহারা আকৃতিশ্রী তাঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-তত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধের অনাদর করিতে পারেন না। জাতিবিভাগনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ সমন্বয়ের সূত্র ভিন্ন বেশী কিছু মনে করা কর্তব্য নয়। এইরূপ রচনাতে প্রমাণ বিচারের ও প্রমাণ বিন্যাসের পারিপাট্যই রচনার উৎকর্ষ সূচিত করে। প্রমাণবিচারে ও প্রমাণ বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে অতুলনীয় বলিলে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না।"[৪৯]

॥ বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কোন দেশের ইতিহাস লিখতে গেলে সে দেশের প্রকৃত যে সত্তা তা উপলব্ধি করা একান্ত দরকার। তা' না হলে কোনো দেশের যথার্থ ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। এই কারণেই ইংরেজরা বাঙ্গলা দেশের সার্থক ইতিহাস রচনায় ব্যর্থ হয়েছেন।

ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস পড়তে বসে আমরা পড়ে থাকি যে, – পালবংশ, সেনবংশ বাঙ্গার রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলজী বাঙ্গা জয় করলেন, পাঠানেরা বাঙ্গার রাজা হলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই ভ্রান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাল, সেন ও বখ্‌তিয়ারের সময় বাঙ্গা নামে কোনো রাজ্য ছিল না। পাল ও সেন গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গার প্রাচীন নাম নয়। 'বাঙালি' বলে কোনো জাতি সেখানকার অধিবাসী ছিল না। আমরা যাকে এখন বাঙ্গা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যারা বাস করত, তারা অন্যজাতির সঙ্গে মিশে আধুনিক 'বাঙালি' জাতিতে পরিণত হয়েছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক রাজ্য ছিল। সর্বত্র অনার্য জাতির বাসভূমি। ক্রমে আর্য প্রাধান্যে প্রথমে হয় এক ধর্ম ও এক ভাষা, তারপর শেষে একচ্ছত্রাধীন হয়ে আধুনিক বাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। যেমন ফ্লোরেন্স বা মিলানের ইতিহাস লিখলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙ্গারও কতকটা তেমনি। তবে ইতালি বলে দেশ ছিল কিন্তু বাঙ্গা বলে কোন দেশ ছিল না। বাঙ্গার ইতিহাসের সূচনা মোগলের সময় থেকে। আর বাঙ্গা একচ্ছত্রাধীন হয়েছে ইংরেজের সময়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের পাশে আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মত উপস্থাপিত করলে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি হবে। একালের ঐতিহাসিকের মতে – "প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাঙ্গা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। .... মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাঙ্গা অথবা বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। এই বাঙ্গা হইতেই ইউরোপীয়গণের 'বেঙ্গলা' (Bengala) ও 'বেঙ্গল (Bengal) নামের উৎপত্তি। মুঘল সাম্রাজ্যের যুগে 'বাঙ্গালা' চট্টগ্রাম হইতে গহি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[৫০]

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর-পূর্ব বাঙ্গার ইতিহাস আলোচনা করে বলেছেন যে, এখন যেখানে 'কামরূপ' প্রাচীন কালে সেখানে 'প্রাক্‌জ্যোতিষ' নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেন। আইন-

আকবরীতে আছে যে, ভগদত্তের বংশের তেইশ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। এক সময় এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। আসাম, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই রাজ্যের রাজা পৃথু-র রাজধানীর ভগ্নাবশেষ তম্মা নামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে পাওয়া গেছে।

কামরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুদিনের জন্য 'রঙ্গপুর' একটি পৃথক রাজ্য হয়েছিল। ধর্মপাল এই রাজ্যের প্রথম রাজা বলে বঙ্কিমচন্দ্র অনুমান করেছেন। তাঁর মতে এই পাল রাজারা ইউরোপের বুর্বোবংশের এবং এশিয়ার তৈমুরবংশের মত নানা দেশে রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পলিরাজা, রঙ্গপুরে পালরাজা, কামরূপে পালরাজা ছিলেন। ধর্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ডিমলার দক্ষিণে পাওয়া গেছে। তার প্রায় একক্রোশ দূরে মীনাবতী গড় ছিল। ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃজায়া মীনাবতীর রাজ্যাধিকার নিয়ে বিবাদবাধে এবং জয়লাভ করে মীনাবতী তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে বসান।[৫১] কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মীনাবতীর হাতেই ছিল।

গোপীচন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্রের পর মাত্র একজন পালবংশীয় রাজা কামরূপ-রঙ্গপুরের রাজা হন। পালবংশের পরে এই অঞ্চলে মেচ, গারো, কোচ, লেপ্চা প্রভৃতি অনার্য জাতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার নতুন আর্যরাজবংশ শাসনক্ষমতা লাভ করে। এই নতুন রাজবংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কামতাপুর নামে নগরী নির্মান করেন। এই নগরের ধ্বংসাবশেষ কোচবিহার রাজ্যে পাওয়া গেছে।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময় রাজ্য সুবিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু গৌড়ের পাঠান রাজার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তারপর এখানে আর্যশাসনের সমাপ্তি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাঠান রাজ হুসেন শাহ রঙ্গপুরের কিছু অংশ অধিকার করেন, এবং রঙ্গপুরের বাকি অংশ ও কামরূপ অধিকার করে কোচেরা কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করে।

।। মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয় ।।

'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, যা এখন বাংলাদেশ নামে পরিচিত, মুসলমান আক্রমনের ঠিক আগে তা' কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল।[৫২] গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাদের মধ্যে একটি রাজ্য। এ সব রাজ্য কেউ কারো অধীন ছিল না। তবে গৌড় এ সব রাজ্যের মধ্যবর্তী হওয়ায়, আর্যপ্রাধান্য হেতু বিদ্যালোচনা, বাণিজ্য প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণে সমৃদ্ধশালী হওয়ায়, এবং বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি প্রবল প্রতাপ রাজাদের রাজত্বকালে সুবিস্তৃত রাজ্যে পরিণত হওয়ায় যথেষ্ট গৌরবযুক্ত ছিল।

এই গৌড়রাজ্যও সেনরাজাদের রাজত্বকালের শেষ দিকে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল। একভাগে ছিল মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা – যার রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী। অপর ভাগ পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ বঙ্গদেশ, সুবর্ণগ্রামের অধিকার-ভুক্ত ছিল। সেখানেও সেনরাজারা রাজত্ব করতেন। যদিও গৌড় প্রাচীন গৌরবে বড়, কিন্তু মুসলমান আক্রমনের সময় তা' গৌরবহীন ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং সে রাজ্য একজন অশীতিপর বৃদ্ধ অক্ষম রাজার হাতে সুপক্ক ফলের মতো দুলছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে আর্যভূমি বলতে চান নি। কারণ, শাসকবর্গ আর্য হলেও প্রজাবৃন্দ ছিল অনার্য। তিনি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা বিচার করে বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম আর্যদের তুলনায় সাম্যময় হওয়ায় ঐতিহাসিক প্রভাতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল। কিন্তু পালবংশের পরে সেনরাজারা পৌরাণিক ধর্ম স্থাপন করলেন। পৌরাণিক ধর্ম বৈষম্যময়। ফল জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ হীনতা। তার প্রমাণ – মুসলমান আমলে বাংলার জনগণের এক বৃহৎ অংশ বৈষম্যময় পৌরাণিক ধর্ম ত্যাগ করে সাম্যময় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল। সেন রাজাদের রাজত্বের শেষভাগে রাষ্ট্রবন্ধনহীন, জাতীয় ঐক্যবোধহীন মানুষ দেশরক্ষায় যত্নবান না হওয়ায় গৌড়রাজ্য মুসলমান কর্তৃক বিজিত হল।

মুসলমানেরা লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছিল এই গল্পকথা বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই বিশ্বাস করেন নি।

সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের মিথ্যা কলঙ্ক বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল এবং এই কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য তিনি যথাসাধ্য যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তাঁর বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত সকল প্রবন্ধেই প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে।

সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিব্রত করত তা' আমরা 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – দ্বিতীয় প্রস্তাব' পাঠে উপলব্ধি করি। সেখানে তিনি বলেছেন – "বল্লালের দেড়শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।"[৫৩] এই বক্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মরক্ষার ভঙ্গি আছে কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত। অবশ্য সে কণ্ঠস্বর আমরা অন্যত্র শুনতে পাই – "সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা।"[৫৪]

এই বক্তব্যই তিনি একটু বিস্তৃত ভাবে বলেছেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন – "সতের জন অশ্বরোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি ? মিন্‌হাজ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। .... সেই গোহত্যাকারী, ফৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবেরা সেই মিনহাজ্‌উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয় ! বিশ্বাস বিশ্বাস না হইবে কেন ?"[৫৫]

'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' – এর কাহিনী আমরা প্রথম জানতে পারি আবু ওমর মিন্‌হাজ উদ্দীন জর্জাতি রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক একটি গ্রন্থ থেকে। মিন্‌হাজ যা লিখে রেখে গিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার সারার্থ উদ্ধার করেছেন[৫৬] –

"৫৯৯ হেজিরা-অব্দে (ইং. ১২০২।৩) মুসলমানেরা বেহার জয় করিয়াছে এবং বাঙ্গালার সীমায় আসিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদেরা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, পুরাণে এরূপ

ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তুর্কিয়েরা বাঙ্গালা জয় করিবে। অতএব মহারাজ নিজ ধনসম্পত্তি, পৌরজন ও রাজধানী নবদ্বীপ হইতে এমন কোন নির্বিঘ্ন ও দূরবর্তী প্রদেশে লইয়া যান যে, সেখানে এই বৈরীবর্গের আক্রমণের কোন শঙ্কা না থাকে।

এই কথা শুনিয়া, রাজা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে পুরুষ বাঙ্গালা জয় করিবে, পুরাণে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি না। ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিল – হাঁ আছে আর সে বর্ণন, বেহারে যে মুসলমান সেনাপতি নিযুক্ত আছে, তাহারই অনুরূপ।

রাজা তখন অতিশয় বৃদ্ধ, এবং নবদ্বীপের পক্ষবাদী। তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, এবং বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার কোন উপায়ও করিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গ এবং যত প্রধান ব্যক্তি, সকলেই আপন আপন পৌরজন ও ধন-সম্পত্তি 'জগন্নাথ প্রদেশে' (উড়িষ্যায়) অথবা গঙ্গার পূর্বোত্তর পারস্থিত প্রদেশে পাঠাইয়া দিল।

৬০০ হেজিরা অব্দে, (ইং ১২০৩।৪) মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি বাঙ্গালার অরক্ষিত অবস্থার বিশেষ সম্বাদ পাইয়া গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। বেহার হইতে তিনি এমন সত্বর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন যে তাঁহার আগমন কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

নগরের নিকটে আসিয়া তিনি এক বনমধ্যে সৈন্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া সপ্তদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগর রক্ষিবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, যে তাঁহারা রাজদূত; নবদ্বীপাধিপতিকে প্রণাম করিতে যাইবেন। রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগকে পুরী প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। পুরী প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা অসি নিষ্কাষিত-পূর্বক রাজানুচরবর্গকে বধ করিতে লাগিল।

রাজা লাছমনীয়া তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পৌরবর্গের আর্ত্তনাদ শুনিয়া, খড়্গদ্বার দিয়া, পুরী হইতে পলায়ন করিলেন। একখানা ডিঙ্গীতে চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে নদী বাহিয়া গেলেন।

মুসলমান সেনার অবশিষ্ট ভাগ এক্ষণে আসিল। তাহারা কতকগুলি হিন্দুকে প্রাণে বধ করিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিল।"[৫৭]

মিন্‌হাজের লেখা কাহিনী বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, সপ্তদশ পাঠানের বঙ্গজয় কাহিনী মিথ্যা। কারণ, প্রথমতঃ মিন্‌হাজ নিজেই লিখেছেন যে, অবশিষ্ট সেনা পরে এসে 'নগর ও পুরী অধিকার' করেছিল। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজ্য-জয় দূরে থাক, নগরজয় দূরে থাক, লক্ষ্মণাবতী রাজপুরীও জয় করতে পারেনি। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন পালিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাজপুরীর রক্ষকেরা যুদ্ধ করে সেই সপ্তদশ অশ্বারোহীকে বিমুখ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রূপ করে বলেছেন – "সপ্তদশ অশ্বারোহী কিছু করিতে পারে নাই – কেবল তাহারা মার্শম্যান প্রভৃতি স্থূলবুদ্ধি সাহেবদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে।" [৫৮]

দ্বিতীয়তঃ মিন্‌হাজ তাঁর বর্ণনার শেষে জানিয়েছেন যে, "বখ্‌তিয়ার এক বৎসরে বাঙ্গালাজয় সম্পন্ন করিলেন।" [৫৯] সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী যে বাংলা জয় করেনি তা' মিন্‌হাজের রচনাতেই প্রমাণিত।

তৃতীয়তঃ ঐতিহাসিক তথ্য বিচারে দেখা গেছে যে, বখ্‌তিয়ার এক বছরেও সমগ্র বাংলা জয় করতে পারেনি। বাংলা যে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল বখ্‌তিয়ার তার একটি মাত্র জয় করেছিল। যে রাজ্যটি জয় করেছিল, তার নাম লক্ষ্মণাবতী। প্রকৃত-পক্ষে পাঠানেরা কোনদিনই সমগ্র বাংলা জয় করতে পারেনি।

চতুর্থতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ মিন্‌হাজউদ্দীনের কথা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেন নি। কারণ, (১) মিন্‌হাজ সে সময়ের লোক নন, ফলে মুসলমানেরা যখন বাংলা জয় করেন সে সময়ে তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন না। (২) মিন্‌হাজ কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনে এ কাহিনী বিবৃত করেন নি। (৩) তিনি কোনো বিশ্বস্ত সূত্র থেকেও এ কাহিনী সংগ্রহ করতে পারেন নি। সম্ভবত, মিন্‌হাজ, বাংলজয়ের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী, কোন অতিবৃদ্ধ মুসলমান সৈনিকের কাছ থেকে 'মুসলমান কর্তৃক বঙ্গজয়'-এর কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য – "ইং ১২৪৪ সালে, তৈমুর খাঁ ও তোখন খাঁ নামক দুইজন মুসলমানে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ হয়। ইতিহাসে

পড়া যায়, মিন্‌হাজউদ্দীন মধ্যস্থ হইয়া রফা করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গাঁলা জয়ের ৪০ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গাঁলায় আসিয়াছিলেন। এই ৪০ বৎসর পাঠানেরা নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত ছিল। কতকগুলি যোদ্ধা, যদি চল্লিশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিবে এমত সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধেই সবাই মরিবে এমত বলিতেছি না। ইহা সম্ভব নহে, যে বখ্‌তিয়ার কতকগুলি অপোগন্ড শিশু বা কিশোর বয়স্ক কুমার লইয়া অপরিচিত দেশ জয় করিতে আসেন। অতএব তাঁহার সহচর যোদ্ধৃবর্গ, আর ৪০ বৎসরের মধ্যে সহজেই – কেবল মনুষ্যজীবনের ক্ষুদ্র আয়তন পূর্ণ হইল বলিয়াই – স্বর্গারোহণ করাই সম্ভব। তবে, যদি লড়াই ঝগড়া না থাকিত, তাহা হইলেও সত্তর আশী বৎসরের বুড়া দুই চারিজনকে পাওয়া গেলে যাইতে পারিত। কিন্তু যখন বঙ্গবিজেতা-দিগকে প্রতিবৎসর অসিহস্তে যুদ্ধে বাহির হইতে হইয়াছে, তখন চল্লিশ বৎসর পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া যাইবে ইহা বড় সম্ভব নয়। ধরা যাউক, যে চল্লিশ বৎসর পরেও কেহ কেহ বাঁচিয়াছিল! যদি কেহ ছিল, তবে তাহাদের কথায় কতদূর বিশ্বাস করা উচিত? যদি কেহ বাঁচিয়া থাকে, তবে দুই একজন বুড়া মাত্র। বাঙ্গাঁলা জয়ের গল্পটা তাহাদের একচেটে মহল – কেহ প্রতিবাদ করিবার নাই। তারপর বুড়া বয়সে কিছু গালগল্পের শ্রীবৃদ্ধি – মনুষ্য মাত্রেরই এই স্বভাব। তারপর, গল্পটার বিষয় আপনাদের মরদানি – সেই বহুকাল অন্তর্হিত জোয়ানগির বাহাদুরি। তার উপর বিজিত, ঘৃণিত, শত্রুপদেস্থিত, কাফেরদের জব্দ করার কথা। সেই বুড়ারা যে আপনাদের কেরদানি না বাড়াইয়া, মিন্‌হাজউদ্দীনকে সত্য কথা বলিয়াছিল, যাহার বিশ্বাস হয় হৌক – আমি এমন বিশ্বাস করিব না।" [৬০]

মিন্‌হাজ কথিত বখ্‌তিয়ার খিলজির নদীয়া অভিযান কাহিনী আধুনিক কালের ইতিহাসিকবৃন্দ সম্পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করেন না। কারণ, প্রথমতঃ এই কাহিনী কোন লিখিত দলিল বা বিবরণের উপর ভিত্তি করে রচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ সমসাময়িক আর কোনো ঐতি-হাসিক এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। তৃতীয়তঃ এই কাহিনীর মধ্যে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ আছে। ফলে এই কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনার মর্যাদা দেওয়া যায় না। চতুর্থতঃ সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গজয় কাহিনী অবিশ্বাস্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ', সুতরাং গ্রহণীয় নয়।

তবু এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ অমূলক বলে পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়। খুব সম্ভব বখ্‌তিয়ার খিলজি ক্ষুদ্র একটি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বিহার থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে অতর্কিতে এই নগরী আক্রমন করেন এবং নগরী লুণ্ঠন করে ফিরে যান। এমন মনে করার কারণ, প্রথমতঃ ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘিসুদ্দিন উজবেক নদীয়া জয়ের চিহ্ন স্বরূপ যে মুদ্রা প্রচলিত করেন, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তার আগে নদীয়ায় তুর্কীশাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কবি শরণ লিখেছেন যে, লক্ষ্মণ সেন এক ম্লেচ্ছ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এ থেকে অনুমান হয় যে, পরবর্তী কালে লক্ষ্মণ সেন মুসলমান আক্রমন প্রতিহত করেন। তৃতীয়তঃ লক্ষ্মণসেনের দু'টি তাম্রশাসন থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখ্‌তিয়ারের নদীয়া আক্রমনের পরেও লক্ষ্মণ সেন দু' বছর রাজত্ব করেন। ঐ তাম্রশাসনদুয়ে বাঙ্গালাদেশের গুরুতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের আভাস নেই। চতুর্থতঃ লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয়, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন, সিংহাসনে বসেন। একটি তাম্রশাসনে তাঁদের 'যবনাম্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্র' বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ে মুসলমানরা বঙ্গদেশ জয় করতে পারেনি।

পরিশেষে বলা দরকার যে, মুসলমানরা উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করলেও পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে সহজে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। এই অঞ্চলে সেনবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। পূর্ববঙ্গে ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দেও মধুসেন নামে একজন সেনবংশীয় রাজার রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-দশকের আগে মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গের কোনো অংশ অধিকার করতে পারেনি। দক্ষিণবঙ্গ বিজিত হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো মুসলমান ঐতিহাসিক বখ্‌তিয়ার খিলজিকে 'বঙ্গবিজেতা' বলেন নি। তাঁরা বখ্‌তিয়ার ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিজিত রাজ্যকে কখনো 'বঙ্গরাজ্য' বলেন নি, বলেছেন 'লখনৌতি রাজ্য'। মিন্‌হাজউদ্দীন যখন ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশে আসেন তখন 'বঙ্গদেশে' লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা রাজত্ব করছিলেন একথা মিন্‌হাজউদ্দীনই বলে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করেছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা স্বজাতির গৌরব-কীর্তন করতে গিয়ে অনেক স্থলেই ইতিহাসের প্রকৃত সত্য গোপন ও বিকৃত করেছেন। উদা-হরণ স্বরূপ প্রথমতঃ তিনি রাজপুতানার কথা বলেছেন। মুসলমানেরা রাজপুতদের হাতে

পুনঃ পুনঃ পরাভূত হয়েছে, কিন্তু কোনো মুসলমান ঐতিহাসিক সে কাহিনী লেখেন নি। সৌভাগ্যক্রমে রাজপুতদের ইতিহাস আছে এবং কর্ণেল টড রচিত **Annals and Antiquities of Rajathan** নামক বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে সে ইতিহাস আমাদের জ্ঞানগোচর হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র দাক্ষিণাত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে দাক্ষিণাত্য মুসলমানের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তার আগে মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়েছে। হিন্দুদের মুখোজ্জ্বলকারী মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্তৃক মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে ৩৫,০০০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৭,৩৩,০০০ হাজার পদাতিক সমবেত করেছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র **Hunter's Orissa** গ্রন্থের বক্তব্যকে প্রামাণ্য বলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য — "পাঠান বা মোগল, মহারাষ্ট্র বা ইংরেজ, ভারতবর্ষে কেহ কখন আট লক্ষ সৈন্য এক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ভারতবর্ষের মুসলমানি ইতিহাসে এই মুসলমানের যমদন্ড স্বরূপ মহাবীরপুরুষ সম্বন্ধে কি লেখা আছে ? আমি ফারসি জানি না, কিন্তু যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাঁহারা কৃষ্ণরায়ের নামও করেন নাই। এ সকল নাম করিয়া তাঁহারা লেখনীকে পাপগ্রস্ত করেন না। শেরসাহা বাঙ্গালার জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস সেখজীরা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না — রাজা গণেশ বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস মোটে তিন ছত্র লিখিলেন।" [৬১]

তৃতীয় উদাহরণ — উড়িষ্যা। মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যা জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে তোঘন খাঁ উড়িষ্যা আক্রমন করেন। সে সময়ে কোণার্কের আশ্চর্য সূর্যমন্দির নির্মাণকারী গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহ দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তিনি তোঘন খাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন এবং তোঘনের পশ্চাদধাবন করে গৌড় নগরী লুণ্ঠন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরেশতা এই ঘটনা লইয়া বড় গোলে পড়িলেন। হিন্দুর হাতে মুসলমানের এ অপমান কি প্রকারে লেখেন ? বুদ্ধি খরচ করিয়া লিখিলেন, জঙ্গাস্ খাঁ তাঁহার অসংখ্য সেনা প্রবাহ লইয়া আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তার কৃপায়, যাজপুরের লাঙ্গুলীয় (নরসিংহ দেব)

পৃথিবী প্রমথনকারী জঙ্গীস্ খাঁ হইয়া গেল — উড়িষ্যার খন্ডাইতেরা মোগলসেনা হইয়া গেল। আর বাকি কি ?

এইত মুসলমানি ইতিহাস। মিন্হাজউদ্দীনও সেই গোষ্ঠী। তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্বাচন করা যাইতে পারে না। বখ্-তিয়ারের কামরূপের যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মিনহাজউদ্দীন উপন্যাস লেখক — ইতিহাস লেখক নহেন।" [৬২]

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদের বিরুদ্ধে প্রায় অনুরূপ অভিযোগ এনেছেন এবং ইংরেজের রচিত পলাশীযুদ্ধের কাহিনীকে তিনি 'সপ্তদশ অশ্বারোহীর আর এক এডিশন' [৬৩] বলে নিন্দা করেছেন।

বাঙ্গালার কলঙ্ক

'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির দুর্বলতার ও ভীরুতার দুর-পনেয় কলঙ্ক অপনোদনে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতের যা কলঙ্ক বাংলারও সেই একই কলঙ্ক। তবে বাংলার কলঙ্ক অনেক গাঢ়। কারণ, কখনো কখনো ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙালির বাহুবলের প্রশংসা কখনো শুনতে পাওয়া যায় না। "সকলেরই বিশ্বাস, বাঙালী চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রী-স্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পালাইয়া যায়।" [৬৪]

বাঙালি সম্পর্কে এ কলঙ্কের যাঁরা প্রচারক তাঁদের মধ্যে অন্যতম মেকলে। মেকলের প্রচার — **"The physical organisation of the Bengali is feeble even to effiminancy. He lives in a constant Vapour bath. His pursuits are sedentary, his limbs delicate, his movement languid .... perjury, forgery, are the weapons, offensive and defensive of the people of lower Ganges."** [৬৫]

মেকলের এই প্রচার বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 'জাতীয় নিন্দা'রূপে প্রতিভাত হয়েছে। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লিখেছেন — "মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,

এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙালীর এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।" [৬৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙালি পাঁচশ' বছর মুসলমানের অধীন ছিল বলে তাদের অসার ও গৌরবশূন্য বলা সঠিক নয়। কারণ, পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ জাতিই কখনো না কখনো অপরের অধীন ছিল। যেমন ইংরেজ নর্মানের অধীন, জার্মান প্রথম নেপোলিয়নের অধীন, স্পেনীয়রা আটশ' বছর মুসলমানের অধীন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "আরবদেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমন করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে ভারতবর্ষ। আরব্যরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, অফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে।" [৬৭] কিন্তু "মুসলমানেরা সহজে বাঙালা জয় করে নাই – কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন্ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, ইহা 'ভারতকলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ – (১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর (৩) রাজস্থান (৪) দাক্ষিণাত্য (৫) বাঙালা।" [৬৮] সুতরাং বাঙালিকে স্ত্রীস্বভাব ও কাপুরুষ বলা চলে না।

বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতকে (**Pala and Sena Dynasties of Bengal** ------ প্রবন্ধে প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্র প্রামাণিক এবং অখন্ডনীয় বলে স্থির করেছেন। তাঁর মতে পালবংশীয়েরা আগে বাংলার অধীশ্বর ছিলেন পরে সেনবংশীয়েরা বাংলার রাজা হন – এমত যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় বংশীয়েরা একই সময়ে রাজত্ব করতেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। সেনবংশীয়েরা পূর্ব-বাংলার সুবর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন আর পালবংশীয়েরা আধুনিক মুঙ্গেরের রাজা ছিলেন। পরে সেনরাজারা পালরাজ্য অধিকার করে উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হন।

বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, সেনাবাহিনীতে বাঙালি সিপাহীর স্থান হয় না, কিন্তু বিহারীরা উৎকৃষ্ট সিপাহী বলে পরিচিত। অথচ পূর্বাঞ্চলবাসী বাঙালিরা বিহার জয় করেছিলেন। সেনবংশীয়দের রাজত্ব বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত মগধরাজ্য বাঙালি কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হয়েছিল। সুতরাং "বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতার এবং চিভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।" [৬৯] এই বক্তব্যের সমর্থনে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি স্মরণীয় – "আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি, বাঙালীর বাহুবল সত্য সত্যই একদিন তাহার গর্বের বিষয় ছিল। বাঙালী শশাঙ্ক কান্যকুব্জ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়া যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাঙালী ধর্মপাল ও দেবপাল তাহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া সুদূর পঞ্চনদ অবধি বাহুবলে বাঙালীর রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙালী ধর্মপাল কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্রাটের আসনে বসিতেন, আর সমগ্র আর্যাবর্তের রাজন্যবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। গঙ্গাতীরে মৌর্য-সম্রাট অশোকের কীর্তিপূত পাটলিপুত্র নগরীর রাজসভায় ভারতের দূর-দূরান্তর প্রদেশ হইতে আগত সামন্ত রাজন্যবর্গ উপঢৌকনসহ নতশিরে দন্ডায়মান হইয়া পাল সম্রাটের প্রতীক্ষা করিতেন। ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য ঘটনা। আজ বাঙালী ভীরু, দুর্বল বলে খ্যাত, ভারতের সামরিক শক্তিশালী জাতির পঙক্তি হইতে বহিষ্কৃত – কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাস মুক্তকন্ঠে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।" [৭০] আমরা যেন রমেশচন্দ্রের কন্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী শুনতে পাচ্ছি।

গ্রীকবীর আলেকজান্ডার ভারতত্যগের আগে তাঁর বিজিত রাজ্যাংশের শাসক নিযুক্তি করেছিলেন গ্রীক সেনাপতি সেলুকস নিকোটরকে। সেলুকস ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে মেগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীক রাজদূত প্রেরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগস্থিনিসের বিবরণ [৭১] থেকে আমরা 'গঙ্গারিডি' নামে এক জনপদের কথা জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন – "ঐ জনপদের স্থাননির্ণয়ে তিনি (মেগাস্থিনিস) এই রূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্বসীমা। .... এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমন করিতেন না। তিনি (মেগাস্থিনিস) ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্বজয়ী আলেকজান্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্যের ভয়ে আলেকজান্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগস্থিনিস। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।"[৭২]

ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষ বলেছেন – "গঙ্গারিডিদের সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল এই সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত ডিওডোরাস সিকিউলাসের (জন্ম খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী) একটি মন্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে। বলাই বাহুল্য, এই উক্তিটি আলেকজান্ডার অথবা আলেকজান্ডারের পরবর্তী সময়ে কোন উৎপত্তিস্থলের সঙ্গে জড়িত। উক্তিটি এই রকম : –

> **'Now this river which (at its source) is 30 stadia broad, flows from north to south and emties its water into the ocean forming the eastern boundry of the Gangaridai, a nation which possess a vast force of largest size elephants. Owing to this their country has never been conquered by any foreign king; for all other nations dread the overwhelming number and strength of these elephants ....'**

এখানে যেমন গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অথবা জাতির একটা অস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, তেমনই তাদের সামরিক শক্তির গোপন সূত্রটির কথাও বলা হয়েছে। ডিওডোরাসের একই জবানিতে আমরা অন্য একটি বিষয়েও অবগত হই, যেমন –

> 'Alexander the Makedonian, after conquering all Asia, did not make war upon the Gangaridai, as he did all others; for when he arrived with all his troops at the river of Ganges, and had subdued all the other Indians, he abondoned as hopeless an invasion of the Gangaridai when he learned that they possessed four thousand elephants well trained and equipped for war'. (Ancient India as described by Megasthenes and Arrian - J.W.Mccrindle). [৭৩]

আধুনিক যুগে গঙ্গারিডি চিন্তার পথিকৃৎ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ বিষয়ে তিনি তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গঙ্গানদী যেখানে উত্তর থেকে দক্ষিণবাহিনী তা যদি গঙ্গারিডির পূর্বসীমা হয়, তবে ঐ জনপদ বর্তমান 'রাঢ়দেশ'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মেগাস্থিনিসের 'Gangaridae' শব্দটি 'গঙ্গারাঢ়ী' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। 'রাঢ়' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'রাষ্ট্র' শব্দ থেকে। যেমন – সুরাষ্ট্র থেকে সুরাট, মধ্যরাষ্ট্র থেকে মেবাড়, গুর্জরাষ্ট্র থেকে গুজরাট; তেমন – গঙ্গারাষ্ট্র থেকে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ়। কালক্রমে সংক্ষেপার্থ 'গঙ্গা' শব্দ বাদ গিয়ে শুধু 'রাট্' বা 'রাঢ়' শব্দের উৎপত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন যে, ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহ নামে যে কতকগুলি দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ আছে, উইলসন সাহেব ঐ দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহের একটি তালিকা এবং কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। উইলসন সাহেবের ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহে একটি প্রস্তর শাসনের কথা আছে, যা থেকে জানা যায় যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করেন। ইঁতি বাঙালি ছিলেন। রাঢ়ী কোলাহলই

উড়িষ্যা বিজেতা এবং উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ।

উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয়দের সাম্রাজ্য গোদাবরী থেকে সরস্বতী পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলার ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন যা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবরা জেলা, তার সম্পূর্ণ এবং যা বর্ধমান ও হুগলী জেলার অন্তর্গত তার কিছু অংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[৭৪] এই অঞ্চল গঙ্গাবংশীয়দের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্মান উইলিয়ম্ ইংলন্ড জয় করে নর্মান্ডির রাজধানী ছেড়ে ইংলন্ডের রাজধানীতে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন, তেমন গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করে, নিজেদের প্রাচীন রাজধানী ছেড়ে উড়িষ্যায় বাস করতে লাগলেন বটে, কিন্তু তাঁরা পৈত্রিক রাজ্য ছাড়েন নি। খুব সম্ভব পরবর্তীকালে সেনরাজারা গঙ্গারাঢ়ীদের কাছ থেকে রাঢ়দেশের কিছু অংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সব রাজবংশের আবির্ভাব হয়েছিল, এই বাঙালি গঙ্গা-বংশীয়েরা প্রতাপ ও মহিমায় তাদের কারো থেকে ন্যূন ছিলেন না। বাংলার পাঠানেরা যতবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ততবারই পরাজিত, বিতাড়িত ও অপমানিত হয়েছে। সুতরাং বাঙালির বলবিক্রমহীনতার অপবাদ মিথ্যা কলঙ্ক মাত্র।

বঙ্গদেশের কৃষক

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি ইতিহাস বিষয়ক না হলেও এতে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় আছে। প্রবন্ধটি যখন তিনি 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ পুণর্মুদ্রিত করেন তখন পুণর্মুদ্রনের একাধিক কারণ প্রবন্ধটির সূচনাতে ব্যাখ্যা হিসাবে প্রদান করেন। তার প্রথম কারণ ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন — "ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্য্যে লাগিতে পারে।"[৭৫] ইতিহাস চেতনা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের বিশ্লেষণ নিষ্প্রোয়জন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও সেখানে কৃষকের স্থান নিয়ে বঙ্কিম-চন্দ্রের আগেও একাধিক প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। যেমন — ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'The Zemindar and the Ryot', প্রবন্ধটি ক্যালকাটা রিভিউ

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিশোরী চাঁদ মিত্রের 'The Ryot and the Zeminder' প্রবন্ধ। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত – 'Bengal Ryot : Their Rights and Liabilities (Being an Elementary Treaties on the Land of Landlord and Tenant) পুস্তক, ইত্যাদি।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি চার দফায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি "বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে এবং অননুকরণীয় ভাষায় তৎ-কালীন বাঙলা দেশের কৃষকদের দুরবস্থার"[৭৬] বিবরণ। এই প্রবন্ধ পাঠে আমরা তৎ-কালীন ভূমি-ব্যবস্থা, জমিদারদের অত্যাচার ও প্রজার দুর্দশার পরিচয় জানতে পারি। উনিশ শতকের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক "বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ একই সঙ্গে যে ভাবে পাওয়া যায়, অন্যত্র তেমন পাওয়া যায় না।"[৭৭]

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, সাধারণ বিচারে ইংরেজ রাজত্বে দেশের মঙ্গল হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন যে, " .... কাহার এত মঙ্গল ? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে ?[৭৮] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না। যেহেতু বাংলার কৃষকের কোনো প্রকৃত মঙ্গল হয়নি, এবং যেহেতু এই কৃষকেরাই দেশের অধিকাংশ মানুষ, সেহেতু দেশের প্রকৃত কোনো মঙ্গল হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "আমরা এই প্রবন্ধে (বঙ্গদেশের কৃষক) একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।"[৭৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ব্রিটিশ্ অধিকারে দেশ সুশাসিত। সুশাসনের ফল প্রজাবৃদ্ধি। প্রজাবৃদ্ধির ফল চাষ বৃদ্ধি। চাষবৃদ্ধির ফল উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন বৃদ্ধির ফল বাণিজ্য-বৃদ্ধি। এবং সমুদয় ফল ধনবৃদ্ধি। কিন্তু এই ধনবৃদ্ধির ফলে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দিত হতে পারেন নি। কারণ, "অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ

হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।"[৮০]

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।"[৮১] জমিদারেরা কি ভাবে কৃষকের 'হৃদয়শোণিত পান' অপেক্ষা নিষ্ঠুর কাজটি করতেন তা' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্ডিয়ান অবজর্বর' পত্রিকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

বাংলা ১২৭৮ সন, প্রবল বন্যার সময়, একটি গ্রাম সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের মতো জলে ভাসছে, কৃষকদের ধান সব জলে ডুবে নষ্ট হয়েছে, গবাদি পশু সব অনাহারে মারা গেছে, প্রজারা নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাতে শশব্যস্ত। এই দুঃখের সময়ে জমিদার প্রজাদের সাহায্য পাঠাবার পরিবর্তে প্রজাদের কাছ থেকে বাজে আদায়ের জন্য পাইক-পিয়াদা সহ গোমস্তা পাঠালেন। "গ্রামে মোটে ১২। ১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২। ১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক।"[৮২] গোমস্তা মহাশয় একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রজাদের কাছ থেকে ৫৪ টাকা ২ আনা আদায় করতে বসলেন। প্রজারা চেয়ে-চিন্তে, বেচে-কিনে, ধার-কর্জ করে টাকা সংগ্রহ করল। কিন্তু তার ৪।৫ দিন পরে আবার গোমস্তা মহাশয় বাবুদের মেয়ের বিয়ের জন্য ৪০ টাকা আদায় করার জন্য হাজির হলেন। নিরুপায় প্রজারা নীলকুঠি ও মহাজনের কাছে ধার চেয়ে বিফল হল।

"তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল – ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীদিগকে সাজা দিলেন। আসামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, 'প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন

অনুসারে আমি আসামীদিগকে খালাস দিলাম।' সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী খালাস ?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান্ অবজর্বর হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দুষ্ট লোক সকল সম্প্রদায় মধ্যে আছে, দুই একজন দুষ্ট লোকের দুষ্কর্ম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে — এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।" ৮৩

প্রাচীন ভারতে জমিদার ছিল না, এবং প্রজাপীড়নও ছিল না। মধ্যযুগে, মুসলমানদের সময়ে, 'কর-সংগ্রহের কন্ট্রাক্টর' হিসাবে জমিদারের সৃষ্টি। জমিদারেরা রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করতে পারেন ততই তাঁদের লাভ। ফল প্রজাপীড়ন। তারপর ইংরেজ রাজত্বে প্রজার দুরবস্থা চরমে উঠল। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রজাদের গুরুতর সর্বনাশ করলেন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা তিনি 'কর সংগ্রহের কন্ট্রাক্টরদের' চিরস্থায়ী ভূস্বামী করলেন। "তাহাতে কি হইল ? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের সত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন্‌কালে কেহ নহেন — কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র — কস্মিন কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত 'চিরস্থায়ী'।" ৮৪

কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, সে সময়ে, জমিদার, আমলা, মহাজন প্রভৃতি সকলেই কৃষকদের শোষণ করত; আর সে জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ও তার প্রশাসনই বহুলাংশে দায়ী ছিল। যদিও কৃষক, নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের অধিক আদায়ের জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য নিতে পারত, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আইন ও বিচার-ব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র

দেখিয়েছেন যে, বাস্তবে তা সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ব্রিটিশ সরকারের আইন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল কৃষকের স্বার্থের প্রতিকূল এবং কৃষক শোষণের জন্য জমিদারের পক্ষে অনুকূল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ধনী জমিদার আরও ধনী এবং গরীব কৃষক আরও গরীব হয়েছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতিধনবান্ ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। .... এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।" [৮৫]

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহযোগে আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে বঙ্কিমচন্দ্র ধনী জমিদারদের পোষক এবং গরীব কৃষকদের দ্বেষক ছিলেন – এ মত প্রচার এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা বিস্মৃত হইনি যে, বঙ্কিম-চন্দ্র উনিশ শতকের চিন্তানায়ক। যে সময়ে, বাঙালি মনীষার চিন্তার জগতে, একটি স্ববিরোধিতা এবং গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে একটি দ্বিধা কাজ করেছে; যার হাত থেকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। তার চিহ্ন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। আমরা সেরকম মাত্র দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 'বঙ্গদেশের কৃষক' সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ করব।

(১) ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সব আইন হয়েছে, তাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হয়েছে। প্রজার বল হরণ ও জমিদারের বলবৃদ্ধি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রজার এই অনিষ্ট সাধন, ইংরেজদের অনিচ্ছাকৃত ও ভ্রমাত্মক। তাই তিনি জমিদার কর্তৃক প্রজা শোষণ রদ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছেই করুণ আবেদন করেছেন –

"আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি – তাঁহাদের মঙ্গল হউক। – ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক। – তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।" [৮৬] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিচারে ভুল করেছেন যে, যথাসম্ভব বর্ধিত ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারই এ ব্যবস্থার প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক।

(২) এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই যে, প্রজার রক্তশোষণ করেই জমিদারের শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সব ভূস্বামীকে কৃষকের শত্রু ভাবেন নি। তাঁর মতে অনেক জমিদার সদাশয়, প্রজাবৎসল ও সত্যনিষ্ঠ। তবে অত্যাচারী জমিদারও অনেক আছেন; তাঁদের শোধন করার জন্য তিনি 'ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্'-এর কাছে আবেদন করেছেন – "..... (জমিদার) সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজা-পীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদিগের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমিদারদিগেরই হাত। ..... এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করি।" [৮৭] আমরা মনে করি যে, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত সভার কাছে জমিদারের স্বার্থবিরোধী বিচারের দায়িত্ব দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সুবিবেচনার কাজ করেন নি।

বাঙ্গালির বাহুবল

'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধটি ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ নয়। কিন্তু প্রবন্ধটি বঙ্গপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে রচিত এবং এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনারও কিছু পরিচয় আছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের বীরত্ব ও কীর্তি কথা আমরা ইতিহাস পাঠে জানি এবং তাদের কীর্তিচিহ্নও বর্তমান। কিন্তু বাঙালির কোনো কীর্তিকথা আমরা যেমন জানি না, তেমন কোনো কীর্তিচিহ্নও দেখি না। বাঙালির পূর্বগৌরব ও পূর্ববীরত্বের ইতিহাস নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গপ্রীতি ও বাঙালি প্রীতি গভীর, আত্মজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠায়

তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ইতিহাসের সত্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। তাই ইতিহাসের যুক্তি বিচারে তিনি যখন বলেন যে – দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল, এ কাহিনী অমূলক; কাশীপ্রদেশ গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল, এমত গ্রহণযোগ্য নয়; এবং একটি তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনকে যে সর্বদেশজেতা বলা হয়েছে, তা' চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র; তখন, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা, সত্যনিষ্ঠার আলোকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না, বাঙ্গালির বাহুবল নাই।" [৮৮] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙালির দুর্বলতার কারণ তিনটি – (১) জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু – যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, (২) খাদ্যাভাস – ভাত অতি অসার খাদ্য, (৩) বাল্যবিবাহ – অপ্রাপ্ত বয়স্ক পিতা-মাতার সন্তান প্রথমতঃ দুর্বল এবং দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয় সুখে নিরত অপ্রাপ্তবয়স্কের সবল হবার সম্ভাবনা কম।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শারীরিক বল বাহুবল নয়। "উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।" [৮৯]

বাঙালির বাহুবল নেই, এ কথা সত্য। তবে, ভবিষ্যতে কখনো হবে না, একথা বলা যায় না। বাঙালির বাহুবল হবার সম্ভাবনা আছে, "যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয় (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।" [৯০] এই কথাই 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধের সারকথা ও শেষকথা।

ইতিহাসের সংজ্ঞানির্ধারণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, – " ..... বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না।" [১১] কিন্তু এ ইতিহাস যে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ, নবাব-বাদশা ও রাজা-মহারাজাদের জীবনচরিত মাত্র নয়; সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক সমস্যাবলীর রূপায়ণও যে ইতিহাস, একথা বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

বিশুদ্ধ ভাষনচর্চার অভিপ্রায় নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসচর্চায় ব্রতী হন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ লিখেছেন – " ..... প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও প্রখর ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন তা' ছিল মনীষীর গভীরতর সমাজচিন্তারই পরিচায়ক।" [১২] বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা তাঁর ইতিহাস চিন্তাকে পরিপুষ্ট করেছিল বলেই তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনা করতে পেরেছিলেন এবং সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রেরণায় তিনি রচনা করেছিলেন 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সামাজিক ইতিহাস শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের কীর্তি-কলাপ ও ধ্যান-ধারনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য; হাড়ি, ডোম, মুচি, জেলে প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান সকলেই সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গ এবং বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

লোকবৃত্ত রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে তিনি বহু প্রচলিত হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর কাহিনী বলেছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেছেন – " এ ইতিহাস নহে – এ সত্যও নহে – এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্প স্থান দিলাম কেন ? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালার রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজড়া

সচরাচর ঘোরতর গন্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে।"[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের একটি গৌরবোজ্জ্বল সামাজিক ইতিহাস চেয়েছিলেন; কিন্তু বিদেশী ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে তার পরিচয় না থাকায় ঐ সব ইতিহাস গ্রন্থ তাঁর কাছে আদরণীয় হয়নি। পক্ষান্তরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থটির প্রশংসা করে তিনি বলেছেন – "ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"[১৪] এই মন্তব্য থেকে সামাজিক ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন – "মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল? ..... কোন্ কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল, – বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য, কোন্ ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কতদূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক, – স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষগুণ কি কি? তাঁদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে? .... ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া, যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ

সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ; তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া ; সে কোথা হইতে ?

আমাদের এই **Renaissance** কোথা হইতে ? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল ? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল ? ধর্মবেত্তা কে ? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে ? ন্যায়বেত্তা কে ? কে কবে জন্মিয়াছিল ? কে কি লিখিয়াছিল ? কাহার জীবনচরিত কি ? কাহার লেখায় কি ফল ? এ আলোক নিবিল কেন ? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আমলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।" [১৫]

বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে যেমন চেয়েছেন তেমনই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেছেন — " .... বাংলার ইতিহাস রচনায় রাজকাহিনীকে মাত্র একক প্রাধান্য দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি রাজবৃত্তকে একেবারে বহিষ্কৃত করলেও ইতিহাস রচনায় বাধা ঘটতে পারে। আমাদের লোকজীবন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আপাতদৃষ্টিতে অচঞ্চল বলে মনে হতে পারে কিন্তু সংঘাত সেখানেও এসেছে ; কোনোবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে প্রধান, কোনোবার অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষণীয়। নূতন ধর্মের উদ্ভব, সাহিত্যের নূতন বিকাশ, সাধারণ জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন — বাংলার ইতিহাস বিচার করলে এ সবই লক্ষ্য করা যাবে। পাল, সেন, পাঠান অথবা মোগল রাজত্বে সামাজিক জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবর্তন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। সুতরাং লোকবৃত্ত ইতিহাস রচনায় প্রধান হলেও রাজবৃত্তের কাঠামোটিকে অনুসরণ না করলে চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অতীত আলোচনায় বাংলার ইতিহাসের এই দিকটি সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, তাঁর কল্পিত বাংলার ইতিহাসে চারটি স্তর ভাগের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম,

তুর্কী বিজয় পর্যন্ত ; দ্বিতীয়, মোগল বিজয় পর্যন্ত ; তৃতীয়, ইংরেজ বিজয় পর্যন্ত ; চতুর্থ, ইংরেজ বিজয়ের পর। অবশ্য ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবার সময় আসেনি। ইংরেজ রাজত্বে বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রকম দাঁড়াতে পারে, তার ইঙ্গিত অবশ্য তাঁর রচনায় আছে।" [১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র আপন ইতিহাস সাধনাকে 'কুলি মজুরের' কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে তাঁর বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলির 'দর বড় বেশী নয়'। কারণ, " ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী।" [১৭] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য থেকে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা এবং তথ্য ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি আগ্রহকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

তবে এর অতিরিক্ত আরও কিছু এই প্রবন্ধগুলিতে আছে, — তা' হল দেশ প্রীতি। প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য — " দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না ? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, — সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।" [১৮]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের প্রকৃত যে 'ধ্যান' রূপ তা' হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি ধ্যানের দ্বারা 'মৃন্ময়ী' যে দেশ, তাকে 'চিন্ময়ী' দেবীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমরা কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে এই 'চিন্ময়ী' দেবীকে প্রত্যক্ষ করি —
" .... সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা ? হাঁ এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী – মৃত্তিকারূপিণী – অনন্তরত্ন – ভূষিতা – এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ - দশদিক্ - দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু–বিমর্দিত বীরজন কেশরী–শত্রু–নিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না – আজি দেখিব না, কাল দেখিব না — কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না —

কিন্তু একদিন দেখিব – দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী - দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা !" [৯৯] আনন্দমঠ উপন্যাসেও দেখি যে, সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ একই মাতৃরূপ দর্শন করিয়েছেন — 'মা যা হইবেন'। [১০০]

এই যে মাতৃপদেবৃতা 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা' — আমাদের বাংলাদেশ ; বঙ্কিমচন্দ্র সে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনার জন্য বাঙালি মাত্রকেই আহ্বান করে বলেছেন — " তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ? " [১০১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যে তাঁর ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা দেশপ্রেমের তুলিকায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

স্বদেশপ্রীতির আবেগ বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রধান মূলধন ছিল, কিন্তু তিনি আবেগ সর্বস্ব ছিলেন না। তাঁর স্বদেশ প্রীতি কোথাও প্রবল হয়ে সত্যানুসন্ধিৎসার পথকে রুদ্ধ করেনি। যুক্তি ও প্রমাণ বিচারে প্রাপ্ত প্রকৃত সত্যকে কখনো তিনি প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস করেন নি। সত্যানুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি ও স্বদেশপ্রীতির বশে তিনি ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বদলির চাকুরীতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে স্থান থেকে স্থানান্তরে থেকেও তিনি যে গভীর অধ্যবসায় ও কঠোর নিষ্ঠা সহকারে আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির সামনে স্বদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরার অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন তা যে কোনো ইতিহাস গবেষকের কাছে গ্রহণীয় আদর্শ হতে পারে।

সূত্র - নির্দেশ

১। ভবতোষ দত্ত — চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃঃ ২০।

২। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের 'সনদ আইন'-এর ৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, প্রতি বছর সাহিত্যের উন্নতি ও নতুন গবেষণার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু সেখানে 'সাহিত্য' বলতে প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করে না দেওয়ায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে লর্ড মেকলে General Committee of Public Instruction -এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। তিনি এই দ্বন্দ্বের সমাধান কল্পে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ 'মেকলে মিনিট' নামে পরিচিত। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে এই 'মিনিট'-কে আইনে পরিণত করেন। এই সূত্র ধরে বাংলাদেশের শিক্ষালয়ে ইতিহাস শিক্ষার শুভ-সূচনা হয়।

৩। প্রবোধ চন্দ্র সেন - বাঙলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ১০৫।

৪। সজনী কান্ত দাস — বঙ্কিম চন্দ্র ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খন্ড), ১৩৮৮, পৃঃ ১৭।

৫। অলোক রায় — বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ভাবনা, আকাদেমি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ১৯৮৯, পৃঃ ৯।

৬। Pratulchandra Gupta — Foundation of the University, Hundred years of the University of Calcutta, Ed. by Pramatha Nath Banerjee & Others, 1957, p.64.

৭। C.U.Magazine, May I,1894. — উদ্ধৃতি, সত্যনারায়ণ দাশ, বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা, ১৯৭৪, পৃঃ১২৫(টীকা)।

৮। ১৮৪৯ অক্টোবর থেকে ১৮৫০ সেপ্টেম্বর শিক্ষাবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের স্কুলে জুনিয়র সেকশনের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন সেখানে তাঁকে 'বঙ্গেতিহাস' পড়তে হয়েছিল। খুব সম্ভব এই 'বঙ্গেতিহাস' মার্শম্যানের History of Bengal - এর বঙ্গানুবাদ। কিন্তু অনুবাদক কে ছিলেন তা জানা যায় না।

৯। প্রবোধ চন্দ্র সেন — বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ২২।

১০। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকাল, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪, পৃঃ ১০৬।

১১। অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য্য — বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, ১৯৭১, পৃঃ ১৩৫।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গদর্শন, পত্রসূচনা, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, ১২৭৯, (পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮০), পৃঃ ৫।

১৩। সত্যনারায়ণ দাশ — বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩।

১৪। B.P.Mukherji — History; A.C.Gupta (ed.), Studies in the Bengal Renaissance, 1958, p.360.

১৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — 'বঙ্কিম চন্দ্র কাঁঠাল পাড়ায়' ; সোমেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪, পৃঃ ৭৬।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিজ্ঞাপন, বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ), বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ১০৩০।

১৭। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অধিকাংশ রচনায় লেখকের নাম মুদ্রিত হত না। 'মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম মুদ্রিত ছিল না। প্রবন্ধটি বঙ্কিম-রচনাবলীতেও সংকলিত হয়নি। তবে প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা, প্রবন্ধ মধ্যে তার প্রমাণ আছে — " ভারতবর্ষীয় প্রজার পক্ষে রাজা রাজার .... একথা ভারত-কলঙ্কে একবার বুঝাইয়াছি।" 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা।

১৮। রমাপ্রসাদ চন্দ — ইতিহাসে বাঙালী, ১৯৮১, পৃঃ ৫১।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — প্রথম প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩১৯—২০।

২০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২১।

২১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২২।

২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব, বঙ্গ দর্শন, ৪র্থ খন্ড, অষ্টম সংখ্যা, ১২৮২, (পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮০), পৃঃ ২৮৯।

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৪।

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৫।

২৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

২৬। নীহার রঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস, ১৯৮০, পৃঃ ১৮১—৮৩।

২৭। রমাপ্রসাদ চন্দ — ইতিহাসে বাঙালী, ১৯৮১, পৃঃ ৫১।

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

২৯। রমেশ চন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃ: ২৬৭।

৩০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্রের প্রতি মাধবাচার্য্যের উক্তি স্মরণীয় — "যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে।"; বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ: ২০১।

৩১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৭–৩৮।

৩২। বিদ্যাপতি বাঙালি কবি নন, মৈথিলী কবি — এ তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, ১২৮২, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধে। তার আগে পর্যন্ত সকলে বিদ্যাপতিকে বাঙালি কবি বলেই জানতেন। তাছাড়া নানা কারণে আজও বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩৩। **Tapan Roy Choudhuri** — **Bengal Under Akbar and Jehangir, 1953, p.43.**

৩৪। ভবতোষ দত্ত — চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃ: ১০৭।

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৬।

৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৬।

৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইতিহাস, (প্রবোধ চন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত), ১৩৬৮, পৃ: ৫।

৩৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৬।

৩৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৭।

৪০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৫২।

৪১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২।

৪২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫২–৫৩।

৪৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫৩।

৪৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬০।

৪৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২।

৪৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২–৬৩।

৪৭। বঙ্কিমচন্দ্রের পর **Sir Herbert Risley** বাঙালির উৎপত্তি বিচারে ভাষা ছেড়ে আকৃতির উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে বাঙালি মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রনে উৎপন্ন। কিন্তু পন্ডিত প্রবর রমা প্রসাদ চন্দ তাঁর **'Indo Aryan Races'** গ্রন্থে রিজলী সাহেবের মতের প্রতিবাদ করে বলেন, যে, পামির ও টাকলামাকান অথলের অধিবাসী হোমো আলপাইনাস নামে অভিহিত এক জাতীয় মানুষই বাঙালির আদি পুরুষ। এ ছাড়া আরও অনেকে এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার সাধারণ ভাবে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সিদ্ধান্ত মান্য করেন। বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ে **'Journal of Asiatic Society of Bengal, N.S.XXIII, p.301-33** - এ অধ্যাপক মহলানবীশের যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই প্রবন্ধটির সার–সংকলন করেছেন তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)' নামক গ্রন্থে।

৪৮। রমেশ চন্দ্র মজুমদার – বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃ: ১৪–১৫।

৪৯। রমা প্রসাদ চন্দ – ইতিহাসে বাঙালী, ১৯৮১, পৃ: ৫২।

৫০। রমেশ চন্দ্র মজুমদার — প্রাগুক্ত, পৃ: ১।

৫১। তিব্বত দেশীয় লামা তারানাথ ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচ্যদেশে তিনি শুধুমাত্র ভঙ্গন (বঙ্গাল) দেশের রাজবংশের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে বাংলায় পালবংশীয় রাজাদের আগে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশের রাজা মিলচন্দ্র বাংলা, ত্রিহুতি, কামরূপ প্রভৃতি দেশ শাসন করতেন। বিমলচন্দ্রের পুত্র গোবিচন্দ্র। বাংলাদেশের রাজা গোপীচন্দ্র (গোপীচাঁদ) ও তাঁর মা ময়নামতী সম্পর্কে যে বহু প্রবাদ, কাহিনী ও গীতিকাব্য প্রচলিত আছে, অনেকের মতে সেই রাজা গোপীচন্দ্র এবং তারানাথ কথিত গোবি-চন্দ্র এক ও অভিন্ন। তবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি।

৫২। প্রাচীন বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হল — উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে সমতট, হরিকেল, বঙ্গ ও বঙ্গাল (বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি পৃথক রাজ্য); এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। এ সব রাজ্যের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না।

৫৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব বঙ্গদর্শন ৪র্থ খন্ড, অষ্টম সংখ্যা, ১২৮২, (পুণর্মুদ্রন, ১৯৮০), পৃ: ২৯৫।

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩১।

৫৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড) ১৩৯২, পৃ: ৩৩৭।

৫৬। বঙ্কিমচন্দ্র মিন্‌হাজ রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থটি পাঠ করেন নি। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ফারসি জানতেন না এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত গ্রন্থটির কোন পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী অনুবাদ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' নামক প্রবন্ধে মিন্‌হাজ কথিত মুসলমানদের বাংলা জয়ের কাহিনীর যে সারার্থ প্রদান করেছেন তা' Charles Stewart - এর History of Bengal গ্রন্থ থেকে হুবহু অনুবাদ।

৫৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়, বঙ্গদর্শন, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৮১ (পুন-র্মুদ্রণ, ১৯৮২), পৃ: ১৬৪-৬৫।

৫৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।

৫৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।

৬০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬-৬৭।

৬১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯।

৬২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭০।

৬৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

৬৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ:৩৩৩।

৬৫। Macqulay's Writings on India — Quoted, R.K.Das Gupta in C.H. Philips (ed.) Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1967, p.236.

৬৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৩।

৬৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ভারত-কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ২৩৫।

রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ২৮৭।

৬৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৬।

৬৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩।

৭০। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃঃ ২৬৭–৬৮।

৭১। মেগাস্থিনিস সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে বেশ কয়েক বছর ছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাসমূহ গ্রীক ভাষায় রচিত 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থটি অখন্ডভাবে উত্তকালে আমাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু ঐ মৌলিক গ্রন্থটি নষ্ট হয়ে গেলেও, তার বিভিন্ন অংশ ডিওডোরাস, স্ট্রাবো, কুইন্টাস, কার্টিয়াস, প্লুটার্ক, প্লিনী প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান পন্ডিতদের লেখনীর মাধ্যমে খন্ডিত ও বিচ্ছন্ন ভাবে আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। জার্মান পন্ডিত সোয়েন বেক বিচ্ছিন্ন বিবরণগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পাটনা গণর্ভমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ জে.ডবলিউ, মাকক্রিন্ডল সেগুলি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

৭২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪।

৭৩। প্রভাত কুমার ঘোষ — গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি, ১৯৮৮, পৃঃ ১৯।

৭৪। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গঙ্গানদীর শেষ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়েই সাগরে লীন হয়েছে। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, পান্ডুয়া, পূর্বস্থলী, গৌড় প্রভৃতি রাঢ়দেশেই অবস্থিত।

৭৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ২৮৭।

৭৬। বদরুদ্দীন উমর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, ১৩৮৮, পৃঃ ৬৯।

৭৭। বদরুদ্দীন উমর — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮–৬৯।

৭৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ:২৮৮।

৭৯। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৯।

৮০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯১।

৮১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯১–৯২।

৮২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৬।

৮৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৬।

৮৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৫।

৮৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৩–১৪।

৮৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৭।

৮৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৮।

৮৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালির বাহুবল, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ২০৯।

৮৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২১০।

৯০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৩।

৯১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৪১০,

৯২। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ – আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৭, পৃ: ২২১।

৯৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৪৩–৪।

৯৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩১।

৯৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৮—৩৯।

৯৬। ভবতোষ দত্ত – চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃঃ৯৭-৯৮।

৯৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বিজ্ঞাপণ, বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ) বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ১০৩১।

৯৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩১।

৯৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কমলাকান্ত, আমার দুর্গোৎসব, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৮০।

১০০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৭৭।

১০১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

তৃতীয় অধ্যায়

পটভূমি ইতিহাস (দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা)

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস নিয়ে যে সব উপন্যাস রচনা করেছেন, 'যুগলাঙ্গুরীয়' ভিন্ন, সেগুলির সময়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত, — অর্থাৎ প্রায় ছ'শো' বছর। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই দীর্ঘ কালসীমার মধ্য থেকে উপন্যাসের কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে সর্বত্রই ক্রান্তিকালকে নির্বাচন করেছেন।

কালের হিসাবে 'মৃণালিনী' ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় তুর্কী বিজয় ও তার সমকালের কাহিনী। 'দুর্গেশনন্দিনী' ষোড়শ শতকের শেষভাগে মোগল বিজয় কাহিনী। 'সীতারাম' সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সন্ধিকালে, মোগল শাসনের দুর্দিনে হিন্দুর পুনরুত্থান প্রচেষ্টার কাহিনী। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বাংলাদেশে ইংরেজদের সামরিক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, নবাব মীরকাসিমের পরাজয়ের পর। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এই ক্রান্তিকালের কথা আছে। বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তি প্রাধান্য লাভ করলেও দুর্ভিক্ষ ও দস্যুতার ফলে দেশ ছিল বিশৃঙ্খল। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই বিশৃঙ্খলা দূর করে ইংরেজের সুশৃঙ্খল রাজ্য স্থাপনের কথা আছে। 'দেবী চৌধুরাণী' আনন্দমঠের প্রায় সমসাময়িক কালের কথা।

ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের এই সব ঘটনার উত্থান-পতনের ঘন-ঘটার মধ্য থেকে ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ এবং নাটকীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিক্ষোভের ফলে ঔপন্যাসিকের পক্ষে ইতিহাসের সীমারেখা অতিক্রম করার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় কোথাও উপন্যাসের অনুরোধে ইতিহাসের 'তথ্য'-কে এবং ইতিহাসের অনুরোধে উপন্যাসের 'সত্য'-কে বিকৃত করেন নি। তিনি অসাধারণ প্রতিভা বলে অতীতের প্রাণস্পন্দনটুকু উপলব্ধি করেছেন এবং আশ্চর্য কুহক বলে ভাষার অতীত এক লুপ্ত জগৎকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত ও দীপ্ত করে তুলেছেন।

দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৮০) থেকে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বাংলা–বিহার–উড়িষ্যার পাঠান-বিদ্রোহ এবং মোগল–পাঠানের সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত। এই বিদ্রোহ দমন করেন মোগল–সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি অম্বরাধিপতি মানসিংহ। ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, "During 1590 the rebellion in Bengal, Behar and Orissa was finally crushed by Man Singh and his son Jagat Singh." [১]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন — " বাস্তত : 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিষয় বস্তু হইল মুঘল সম্রাট কর্তৃক পাঠানদের হাত হইতে বঙ্গবিজয়। বঙ্কিম পদে পদে ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া এটাকে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ'ও প্রায়শ: সত্য ইতিহাস হইতে লওয়া এবং সেই যুগের উপযোগী চরিত্র ও ভাব দিয়া সাজাইয়া তাহাদের খাড়া করা হইয়াছে। এমন কি, মানসিংহের বহু–নারী–বল্লভত্ব, রাজপুত–সম্ভ্রান্ত ঘরে নিম্নজাতীয়া বাঁদী ('পাস্‌বান্' বা 'পাত্রী') রাখা: বঙ্গে মানসিংহের প্রতিনিধির অতুলনীয় বীরত্ব এবং অধিক সংখ্যক পাঠান সেনার পরাজয়, দুর্গ মধ্যে অত্যাচার ও খুন – এ সব কথা সেই যুগের সত্য ইতিহাস হইতে জানা যায়। তাঁহার কল্পনা হইতে আসিয়াছে শুধু জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেমকাহিনী এবং আয়েষার দেবকন্যা সদৃশ চরিত্র–কথা।" [২]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনী–সূত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পেয়েছিলেন। তাঁর খুল্লপিতামহের কাছ থেকে।" .... তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়েছেন, যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজ্যাকুরদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তী রূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজ্যাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে

প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎ সিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার-উনিশ বর্ষ বয়ক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হইল।" [৩]

খুল্লপিতামহের কাছে পাওয়া কাহিনী সূত্রের সঙ্গে চার্লস স্টুয়ার্টের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' থেকেও বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। স্টুয়ার্ট লিখেছেন — "In the year 998, the Raja (Man Singh) planned an expedition for the recovery of Orissa out of the hands of the Afghans. Having assembled the troops of Behar, at Bhagalpur, he marched through the Western hills to Burdwan; but previous to his setting out, he had ordered Sayid Khan to march with the troop of Bengal by the route of cutwa, and to form a junction with him at Burdwan. Upon his arival at this place, he received an apology from his deputy, stating that he had experienced so much difficulty and delay in equipping his army, he was afraid the rainy season would set in before anything could be effected against the Afghans; and therefore strongly adviced the Raja to Canton his army till the conclusion of the rains, when he would immediately join him. The Raja was much disappointed at this intelligence; but seeing no remedy, he directed cantonments to be built for the army at Jehanabad, on the bank of the Darkisor river, not many miles distance from present Calcutta." [৪]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে স্টুয়ার্টের এই বর্ণনার প্রায় হুবহু অনুবাদ প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন —

" ১৯৬ সালে মানসিংহ পাটনা নগরীতে উপনীত হইয়া প্রথমে অপরাপর উপদ্রবের শান্তি করিলেন। পর বৎসরে উৎকল বিজিগীষু হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। মানসিংহ প্রথমে পাটনায় উপস্থিত হইলে পর, নিজে তন্নগরীতে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় করিয়া বঙ্গপ্রদেশ শাসন জন্য সৈদ খাঁকে নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। সৈদ খাঁ এই ভারপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশের তাৎকালিক রাজধানী তণ্ডানগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে রণাশায় যাত্রা করিয়া মানসিংহ প্রতিনিধিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সৈদ খাঁকে লিখিলেন,যে, তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত সসৈন্যে মিলিত হইতে চাহেন।

বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন যে, সৈদ খাঁ আসেন নাই, কেবলমাত্র দূত দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে,সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব সম্ভাবনা, এমন কি, তাঁহার সৈন্যসজ্জা করিয়া যাইতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে ; অতএব রাজা মানসিংহ আপাততঃ বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকিলে তিনি সেনা সমভিব্যাহারে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। রাজা মানসিংহ অগত্যা তৎপরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া দারুকেশ্বরতীরে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। তথায় সৈদ খাঁর প্রতীক্ষায় রহিলেন।" [৫]

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ইতিহাস গ্রন্থে স্টুয়ার্ট হিজরী সন এবং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সনের ব্যবহার করেছেন। রাজা মানসিংহ ৯৯৭ হিজরী সন বা ৯৯৬ বঙ্গাব্দে বিহারের বিদ্রোহ দমন করে ৯৯৮ হিজরী সন বা ৯৯৭ বঙ্গাব্দে ঝাড়খণ্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করার জন্য যাত্রা করেন। তিনি ভাগলপুর ও বর্দ্ধমান হয়ে জেহানাবাদে পৌঁছান এবং সেখানে শিবির স্থাপন করেন।

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন' বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের পথে একাকী গমনকারী জগৎসিংহ নামে একজন অশ্বারোহী যুবা পুরুষের সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পাঠকদের প্রথম পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — " জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তর মধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদে ইতিবৃত্ত - সম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য্য ভাল নহে।" [৬] বঙ্কিম-চন্দ্রের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, এখানে তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে ইতিবৃত্ত —

সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদটি সংযুক্ত করেছেন এবং ইতিকথা বিবৃত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর সময় পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে প্রথম রচিত বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থের (Charles Stewart's History of Bengal) অনুসরণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের ইতিহাস এবং কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন। এই উপন্যাস রচনাকালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র সময়কার অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই অজ্ঞাত ছিল। পরবর্তীকালে নবাবিষ্কৃত তথ্যাদির নিরিখে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আমাদের জানিয়েছেন — "বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে ? মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুৎলু খাঁ, খাজা ইসা, উস্মান — ইঁহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং সে যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য ইতিহাস যে, জগৎসিংহ অগণিত পাঠান সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় লন এবং তাহার কিছুদিন পরেই কুৎলু খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান খাজা ইসা কুৎলুর বালক পুত্রদের রাজ্য বাঁচাইবার জন্য মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ভিন্ন 'দুর্গেশনন্দিনী'র আর সব কথা কাল্পনিক। এই সন্ধিতে জগৎ সিংহ মধ্যস্থ ছিলেন না। তবে, বঙ্কিম কি বাকী সব ঐতিহাসিক দৃশ্যপট নিজ কল্পনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ? আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা সকলেই কাল্পনিক। এ কথা পাঠক সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন ; এবং তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জগৎ সিংহের আহত হওয়া, কুৎলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকা, এবং তাহার দ্বারা কুৎলুর মরণকালে সন্ধিভিক্ষা করা, এই শাখাপল্লবগুলি ইতিহাসের বাহিরে হইলেও বঙ্কিমের নিজকল্পনায় সৃষ্টি নহে। এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক সাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান এলেকজাণ্ডার ডাও (Alexander Dow)। এই সাহেবটি ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরেজীতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্রে ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্য্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিস্তাতেও লেখেন নাই; এমন কি, কোনও পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ লেখাও সম্ভব ছিল না।"[৭]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের রচনা ভিন্ন অন্য সূত্র থেকেও আমরা জানতে পারি যে, কতলু খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেওয়ান খাজা ইসা মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন, এই

সন্ধিতে জগৎসিংহ মধ্যস্থ ছিলেন না। ঐতিহাসিক এস.রায় বলেন — ".... the sudden death of Qutlu Khan shortly after disheartened the Afghans. His minister Khvaja Isa raised his young son Nasir Khan to the throne and he made peace with the Mughuls...." [৮]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, পাঠানদের কাছে পরাজিত হয়ে জগৎসিংহ কোনো এক দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু জগৎসিংহ কি অবস্থায় কোন্ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন তার বিবরণ যদুনাথ অন্যত্র দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন — " মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ মদিরামত্ত অবস্থায় কৎলু খাঁর সেনাপতি বাহাদুর কার: কর্তৃক পরাজিত ও আহত হইয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের যত্নে সেই রাজধানীতে পানাইয়া গিয়া বাঁচেন, ইহা সত্য ঘটনা — এবং ইহা আবুল ফজল বর্ণনা করিয়াছেন।" [৯]

পক্ষান্তরে স্টুয়ার্টের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, ধরপুরে আফগানরা জগৎসিংহের কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধির জন্য আলোচনার ভান চালিয়ে যায়, যা জগৎসিংহ ধরতে পারেন নি, এবং সেই সুযোগে, গোপনে কতলু খাঁকে সংবাদ দিয়ে অতিরিক্ত সৈন্য আনিয়ে " .... the Afghans made an attack upon him (Jagat Singh) by night, surprise his camp, took him prisoner, ..." [১০] লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পাঠানদের হাতে জগৎ সিংহের বন্দিত্বের যে বিবরণ স্টুয়ার্ট দিয়েছেন 'আকবরনামা' অনুসারে তা' সঠিক নয়। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে 'আকবরনামা'র বিবরণই মান্য করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদের হাতে জগৎ সিংহের বন্দিত্বের সূত্রটিকেই অত্যন্ত সুকৌশলে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছেন। এই সূত্র ধরেই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রণয় কাহিনীর সঙ্গে আয়েষা ও ওসমান যুক্ত হওয়ায় 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই অনৈতিহাসিক হলেও এই সূত্রকে অবহেলা করা যায় না। আবার এই ঐতিহাসিক বিচ্যুতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেও দায়ী করা যায় না। কারণ, প্রথমত: দুর্গেশনন্দিনীর রচনার সময় পর্যন্ত 'আকবরনামা'র কোনো ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি এবং ফারসি না জানায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল গ্রন্থটিও পড়তে পারেন নি। দ্বিতীয়ত: তিনি তাঁর সময় কালে আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত স্টুয়ার্টের

বাংলাদেশের ইতিহাস যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন, একথা বলা যায় না।

এই উপন্যাসে তিলোত্তমা, বিমলা, আয়েষা, অভিরাম স্বামী প্রভৃতি চরিত্র অনৈতিহাসিক। দাউদ খাঁ, মনাইম খাঁ, খাঁ আজিম, শাহবাজ খাঁ, সৈদ খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই সব ঐতিহাসিক চরিত্রের নামোল্লেখ ভিন্ন উপন্যাসের কাহিনী মধ্যে তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সৈদ খাঁ নামটি প্রকৃত পক্ষে সাইদ খাঁ হবে ; যার অর্থ ভাগ্যবান। সাইদ খাঁ, সৈয়দ বংশোদ্ভূত নন এবং তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী কালে বাংলাদেশের প্রকৃত সুবাদার ছিলেন। মানসিংহ তখন ছিলেন বিহারের সুবাদার। সুতরাং মানসিংহ, সাইদ খাঁকে বাংলায় নিজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র যে বর্ণনা করেছেন তা' সঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভুলের কারণ, স্টুয়ার্টকে অনুসরণ। স্টুয়ার্ট সাইদ খাঁকে বাংলার Deputy Governor হিসাবে ভুল করায় বঙ্কিমচন্দ্রেরও ভুল হয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' মোগল-পাঠানের সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত। মোগল পক্ষের প্রধান দিল্লীর সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ। সম্রাট আকবর তাঁর পিসিকে এবং যুবরাজ সেলিম (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁর কাছে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ পরাজিত হন। তাঁর রণকৌশল ও বাহুবলে বঙ্গদেশ থেকে কাবুল পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপন্যাসের প্রথমখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দারুকেশ্বর নদীতীরে শিবির সংস্থাপন করে সাইদ খাঁর জন্য প্রতীক্ষা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'নবীন সেনাপতি' নির্বাচন করে পাঠানদের গ্রাম-লুণ্ঠন ও প্রজাপীড়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাই, — যা বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ দক্ষতার উপস্থাপিত করেছেন।

এই উপন্যাসে পাঠানপক্ষের প্রধান উড়িষ্যার পাঠান নবাব কতলু খাঁ। ইতিহাস পাঠে আমরা জানি — "Qutlu Khan Lohani, a leiutenant of Daud, defeated several Mughal officers and set up an independent principality in

Orissa." [১১] কতলু খাঁ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে — " কতলু খাঁর এই নিয়ম ছিল যে, কোন দুর্গ বা গ্রাম জয় হইলে, তন্মধ্যে কোন উৎকৃষ্ট সুন্দরী যদি বন্দী হইত, তবে সে তাঁহার আত্মসেবার জন্য প্রেরিত হইত।" [১২] বঙ্কিমচন্দ্রের বিবরণ অনুসারে কতলু খাঁ বিলাসী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। কিন্তু " আকবরনামায় তাঁহাকে crafty এবং scoundrel বলা হইলেও (এই নিন্দাবাদের কারণ এই যে, তিনি দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া নিজেকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।) তাঁহার উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তির উল্লেখ নাই।" [১৩] তবে সে কালের মুসলমান শাসকদের প্রায় সকলেরই বহু উপপত্নী থাকত এবং তাঁরা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন ; তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অবাস্তব বলা যায় না। স্মরণ রাখতে হবে যে, পাঠানেরা মান্দারণের জমিদারের স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যায়, — এ কিংবদন্তী বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল।

তবে এই উপন্যাসে বিমলা কর্তৃক কতলু খাঁর হত্যার ঘটনাটি অনৈতিহাসিক। স্টুয়ার্টের ইতিহাসে, এমন কি কিংবদন্তীতেও, এই প্রসঙ্গ নেই। যদুনাথ সরকার 'আকবরনামা' থেকে অনুবাদ করে আমাদের জানিয়েছেন যে, — " এই সময় শাহানশাহের ভাগ্য ফলিল। দশদিন পরে কতলু মারা গেলেন, তাঁহার রোগ হইয়াছিল এবং শীঘ্রই জীবন শেষ হইল।" [১৪] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ রচনাকৌশল গুণে কতলু খাঁর হত্যার এই ঘটনার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনীর সৌন্দর্য ও নাট্যরস ঘনীভূত হয়েছে।

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস বাংলাদেশের পটভূমিকায় রচিত হলেও এই উপন্যাসের নায়ক বাঙালি বা বঙ্গবাসী নন। অম্বুরাধিপতি মানসিংহের পুত্র ও প্রিয় সেনাপতি রাজপুতকুলতিলক জগৎসিংহ উপন্যাসের বীর্যবান আদর্শ নায়ক। খুব সম্ভব, রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য ও আত্মত্যাগের বিবিধ কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র রাজপুত বীরকে নায়করূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথমখণ্ডের 'কুলতিলক' নামক নবম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে, কুমার জগৎসিংহের বীরত্ব ও রণচাতুর্যে পাঠান সেনা মধ্যে মহাভীতি প্রচার

হয়েছে। পাঠান সেনারা লুটপাট বন্ধ করে দুর্গমধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এবং শত্রুপীড়িত প্রদেশে শান্তি বিরাজ করছে। স্টুয়ার্টের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, পাঠান সেনা ধরপুরে লুটপাট ও অত্যাচার শুরু করলে — "... to put a stop to the ravages of the Afghans, the Raja detached his son, Jaggat Singh, who compelled them to retire, and to take refuge under the guns of a fort, ..." [১৫]

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র জগৎসিংহের যে শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা' স্টুয়ার্টের ইতিহাসের সূত্র অবলম্বনে রচিত। কিন্তু জগৎসিংহের রণবীর্যের বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের গবেষণা কিছু স্বতন্ত্র। তাঁরা তাঁকে 'অনভিজ্ঞ' আখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এস.রায় বলেছেন — "The Afghans surprised and badly defeated the Mughal Advance guard under Man Singh's son, the inexperienced Jagat Singh". [১৬] আধুনিক ঐতিহাসিকের এই বক্তব্য আবুল ফজলের 'আকবরনামা' দ্বারা সমর্থিত। আবুল ফজল লিখেছেন — "The Rajah (Man Singh) sent an army under Jagat Singh, and the worthless Bahadur Kuruh took refuge in a fort, and had recourse to cajolery. But devilish tricks he lulled the inexperienced youth into carelessness, and then asked for help from Qutlu. On 10th Khurdad (21st May, 1590) while Jagat was slumbering from the effect of wine, the wicked Qutlu suddenly fell upon him with a large force and prevailed over him.... Though the imperial army was defeated, yet .... Hambir brought away that infatuated young man and took him to his quarters at Bishnupur. A report are so that he was killed." [১৭] এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, জগৎসিংহ অত্যন্ত মদ্যপ ছিলেন এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য অল্পবয়সে, ৬ই অক্টোবর, ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে, আগ্রার কাছে অকালে মারা যান।

আকবরনামায় পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে জগৎসিংহের মৃত্যু বিষয়ে যে মিথ্যা রটনার কথা আছে তা' স্টুয়ার্টের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। স্টুয়ার্ট লিখেছেন —
".... The Raja was overwhelmed with confusion at the disgrace, and with sorrow on account of his son, who was carried prisoner to Bissnupore, and, according to report which prevailed for some days, had been put to death".[১৮]
এছাড়া মোগল পাঠানের সন্ধির বিষয়ে জগৎসিংহের ভূমিকা সম্পর্কে স্টুয়ার্ট লিখেছেন যে, কতলু খাঁর মৃত্যুর পর "The Afghan chiefs released the son of Raja, and, through him send for peace."[১৯]

বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভা বলে এই সূত্র দুটিকে নিপুণ দক্ষতায় জগৎসিংহের মুক্তি - প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যুক্ত করে আশ্চর্য সৃষ্টি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস পাঠকালে আমরা দেখি যে, ওসমান জগৎসিংহকে মানসিংহ ও কতলু খাঁর মধ্যে সন্ধির মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করে বলেছেন — " মহারাজের নিকট দূত প্রেরণ করা হইয়াছিল ; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার নিকট কে রটনা করিয়াছে যে, পাঠানেরা মহাশয়ের প্রাণহানি করিয়াছে। মহারাজ সেই শোকে ও ক্রোধে সন্ধির নামও শ্রবণ করিলেন না ; দূতের কথায় বিশ্বাস করিলেন না ; যদি মহাশয় স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাবকর্তা হয়েন, তবে তিনি সম্মত হইতে পারিবেন।"[২০]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে পাঠান-যুবক ওসমান এক অসাধারণ মহান চরিত্র। পাঠানকুলতিলক ওসমানের ঐতিহাসিক পরিচয়, তিনি কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিয় সেনাপতি এবং কতলু খাঁর একান্ত অনুগত ভ্রাতা ও দেওয়ান খ্বাজা ইসার পুত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের তিনি প্রতিনায়ক এবং রাজপুতকুলতিলক জগৎসিংহের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন অসম সাহসী বীরযোদ্ধা হিসাবেও তিনি ইতিহাসে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন এবং বাংলাদেশে পাঠানেরা যখন মোগলের হাতে পরাজিত হয় (১৬১২ খ্রিঃ) তখন ওসমান মোগলের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের আবিষ্কৃত একখানি ফারসি হস্তলিপি 'বাহারিস্তান-ই-ঘাইরী'র যদুনাথ সরকার কৃত বঙ্গানুবাদে পাঠানবীর ওসমানের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। [২১]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে অতিথি পরায়ণ, স্বাধীনতা প্রিয় সাহসী বীর এবং মহান পাঠান যুবক হিসাবে অঙ্কন করেছেন। ওসমান যে মহৎচিত্তের যুবক, 'দুর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয়খন্ডের 'কুসুমের মধ্যে পাষাণ' নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেখানে আমরা দেখি যে, ওসমান তাঁর পরমবৈরী, রণক্ষেত্রে তাঁর দর্পহারী, জগৎ সিংহের আরোগ্যলাভের জন্য আয়েষার সঙ্গে জগৎসিংহের সেবা করেছেন। আয়েষা তাঁর এই গুণের প্রশংসা করলে তিনি অপ্রতিভ হয়েছেন এবং এই সেবার দ্বারা জগৎসিংহের আরোগ্য লাভের মধ্যে আপন স্বার্থসিদ্ধি আছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ওসমান সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা পাছে লোকে দয়ালু চিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন, এবং দয়াশীলতা নারী স্বভাব-সিদ্ধ বলে উপহাস করতে করতে পরোপকার করেন। ওসমানের এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য আফগান বা পাঠান জাতির অনুসারী ; যা বঙ্কিমচন্দ্র যথাযথ ভাবে অঙ্কন করেছেন। [২২]

আফগান বা পাঠান জাতির স্বাধীনতা প্রীতির কথা সর্বজন বিদিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয় খন্ডের 'গৃহান্তর' নামক একাদশ পরিচ্ছেদে ওসমান জগৎসিংহকে বারবার পাঠানদের এই স্বাধীনতা প্রীতির কথা বলেছেন। ওসমান বলেছেন — " পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে না ; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখনও করিবেও না ; ইহা নিশ্চিত কহিলাম।" [২৩] প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, 'পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে' জগৎসিংহের প্রতি ওসমানের এই বক্রোক্তি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের। বঙ্কিমচন্দ্র এই তীক্ষ্ণ বক্রের মধ্য দিয়ে বাঙালির সুপ্ত স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার বাসনাকে জাগতে চেয়েছেন। ডঃ বিজিত কুমার দত্ত বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে কেবল পাঠান ও রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের চিত্রই আঁকেন নি, প্রসঙ্গক্রমে বাঙালির বাহুবল প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গে ওসমান যে জগৎসিংহকে অকারণ রাজপুত - পাঠান রক্তপাত বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছেন, তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বিচক্ষণতা লক্ষ্য করা যায়। [২৪]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে আছে হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার মান্দারণ গ্রাম ও তার দুর্গ। এ প্রসঙ্গে Bengal District Gazetteers -এ বলা হয়েছে যে, — "An old place lying in thana Goghat of the Arambagh Sub-division, 7 or 8 miles W.S.W. of Arambagh town. The Burdwan Midnapore road passed west and the old nagpur road a little north of this place. It contains the ruin of two forts, the northern are called Garh Mandaran and the Southern are Bhitagarh." [২৫]

গড় মান্দারণের বিবরণ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, — "যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদ প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। .... গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্য তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগর মধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত ; একস্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা পার্শ্বস্থ এক-খণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল ; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনির্মিত এক গড় ছিল ; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশ পথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূল শিরঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত ; দুই দিকে প্রবল নদী প্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্য্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলঙ্ঘ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন; দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে ; অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে ; তদুপরি তিন্তড়ী, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল কাননাকারে বহুতর ভুজঙ্গ ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগণকে আশ্রয় দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা দুর্গ ছিল।" [২৬]

এই বিবরণ পাঠে আমাদের মনে হয় যে, অত্যন্ত ক্ষীন হলেও, 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনার সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে বাংলার অতীত ইতিহাস ও তার পুরা-কীর্তির প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ বর্তমান ছিল। তিনি ইতিহাসবেত্তার নিষ্ঠা নিয়ে গড়

মান্দারণের অতীত বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। 'কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি' হয়ে যাওয়া স্মৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবংতজ্জনিত প্রাচীন হৃত গৌরব ও সমৃদ্ধির জন্য দীর্ঘশ্বাস ('মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল') বঙ্কিম-চন্দ্রের বর্সেতিহাস চেতনাকে একটি বিশিষ্ট সুর-তন্ত্রীতে বেঁধে দিয়েছে।

।। কপালকুণ্ডলা ।।

'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ এতে স্বল্প ; সে ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের যোগ আরও কম। উপন্যাসের উপাখ্যানের উপর সে ইতিকথার প্রভাবও সামান্য। কিন্তু তবু 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য ও উজ্জ্বল চিত্রকে চমকপ্রদ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথমত: ইতিহাসের পটভূমিতে কপালকুণ্ডলার কাহিনীকে বিস্তৃত করা হয়েছে। কারণ, উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের জীবনের যে অংশ গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিসর সামান্য। তাই নবকুমারের প্রাক্তন - স্ত্রী মোতিবিবির সূত্র ধরে দিল্লী ও সপ্তগ্রাম একত্র গ্রথিত হয়েছে এবং কপালকুণ্ডলার কাহিনী মোগল সাম্রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট কাল-সীমায় ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষেত্রে মুক্তি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসের সুদূরপ্রসারী পটভূমি কপালকুণ্ডলার ট্র্যাজেডিকে সমুন্নতির গৌরব ও গভীরতা দান করেছে। যে মোতিবিবি কপালকুণ্ডলার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তিনি দিল্লীশ্বর আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের অঙ্কশায়িনী এবং ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠসুন্দরী ও ভাবী ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানেরও প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। সুন্দরী অগ্রগণ্যা মোতিবিবির যদি এই আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্যের বাতাবরণ না থাকত তবে তাঁর ঈর্ষা ও চক্রান্ত সাধারণ গৃহস্থ কুলত্যাগিনীর কলহ-কালিমায় কপালকুণ্ডলার কাহিনীকে কলুষিত করত।[২৭]

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাল মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের শেষ সময় থেকে জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহনের সময় পর্যন্ত। উপন্যাসের তৃতীয় খন্ডের, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ; পথান্তরে আমরা দেখি যে জনৈক আগ্রানিবাসী, খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি মোতিবিবিকে অভিবাদন পূর্বক একটি পত্র দিয়েছে। পত্রে মোতিবিবিকে জানান হয়েছে যে, বাদশাহ আকবরের পরলোকে গতি হয়েছে এবং আকবরের আড়ালে কুমার সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ হয়ে মসনদে বসেছেন। ইতিহাস পাঠে আমরাজানি যে, আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয় ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর এবং তার এক সপ্তাহ পরে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারন করে সিংহাসনে আরোহন করেন।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কাহিনী সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন এই ভাবে — "প্রায় দুইশত পথগশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রি শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।" [২৮] গঙ্গা-সাগরের পূণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয় পৌষমাসের সংক্রান্তি তিথিতে। আকবরের মৃত্যু, সেলিমের সিংহাসনারোহণ, গঙ্গাসাগর থেকে মাঘমাসের রাত্রি শেষে নবকুমারের যাত্রা, কাপালিকাবাসে অবস্থান, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে বিবাহ ও গৃহে প্রত্যাবর্তন — এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে অনুমান করা যায় যে, নবকুমারের সঙ্গে মোতিবিবির সাক্ষাতের সময় ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে।

বঙ্কিমচন্দ্র মোগল সাম্রাজ্যের নির্দিষ্ট কালসীমায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পট-ভূমিকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ও তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল ; " [২৯] পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার ঐতিহাসিক সত্য। কবিকঙ্কন চন্ডীতে আছে —

" ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে।।" [৩০]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন — " পর্তুগীজ বণিকেরা যে বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায় বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ পর্তুগীজ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্যজাহাজের উপর জলদস্যুর ন্যায় আচরণ করিত এবং তাহার ফলেই বাংলার জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। আরাকান হইতে মগেদের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গের সমদ্রতীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল। পর্তুগীজরাও তাহাদের অনুকরণে নদীপথে ঢুকিয়া দক্ষিণবঙ্গে বহু অত্যাচার করিত।[৩১]

কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক, মোতিবিবি – এঁরা কেউই ঐতিহাসিক চরিত্র নন। তবে মোতিবিবির চরিত্রে ইতিহাসের ছায়াপাত আছে। মোগল–হারেমে এমন চরিত্র ইতিহাসের সমর্থন–পুষ্ট। কিন্তু মোগল হারেমের কথা আমাদের আলোচ্য নয়। মোগল-হামেমে সেলিম ও মোতিবিবির সংলাপ ও সম্পর্ক এবং মোগল রাজনীতির চক্রান্তও আমাদের পক্ষে পরিত্যজ্য। তবে শের আফগান ও মেহের–উন্নিসার সম্পর্কে কিছু বলার আছে। কারণ, শের আফগান বাংলাদেশের বর্ধমানের জায়গীরদার ছিলেন এবং মেহের–উন্নিসা তাঁর পত্নী।

শের আফগান — **"A persian adventurer called 'Ali Quli', after rendering good military service, had been attached to Salim's staff, and was rewarded by the title of 'Sher Afgan' (tiger slayer) for his gallant conduct during a hunting expedition."** ৩২
মেহের - উন্নিসার সঙ্গে শের আফগানের বিবাহ হয় এবং আকবর তাঁকে বর্ধমানে জায়গীর প্রদান করেন। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে কুৎবুদ্দীন কোকা বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। বাংলায় তখন নানা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহের সঙ্গে শের আফগানের যোগ আছে সন্দেহে, কুৎবুদ্দীন খাঁ তাঁকে বর্ধমানে গ্রেফতার করেন। সেখানে উভয়ের উত্তেজিত বিতর্কের সময় শের আফগান তরবারি দিয়ে কুৎবুদ্দীনের শিরচ্ছেদন করেন। কুৎবুদ্দীনের পারিষদবর্গ শের আফগানকে সঙ্গে সঙ্গে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে।

মেহের–উন্নিসা বা নূরজাহান এই উপন্যাসে প্রায় নেপথ্য চরিত্র। উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমির সুরক্ষা করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তাঁর সম্পর্কে ততটুকুই বলা

হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র মেহের-উন্নিসা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা' ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "মেহের উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সৌন্দর্য্যে ইতিহাসকীর্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্যে-গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া ; কবিতা রচনায় বা চিত্রলেখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন।" [৩৩] ইতিহাসে নূরজাহানের পরিচয় এই ভাবে পাই — **"Nurjahan was indeed possessed of exquisite Beauty, a fine taste for persian literature, poetry and arts, a piercing intellect, versatile temper and sound common sense."** [৩৪]

কপালকুণ্ডলার বঙ্কিমচন্দ্র সেলিম-মেহের-উন্নিসার প্রচলিত প্রণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এ বিষয় ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ — **"finds absolutely no support in the contemporary authorities."** [৩৫]

এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রাম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত। কিন্তু বর্গীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়া আসিতেছিল ; সুতরাং বৃহদাকার জলযান সকল আর নগর পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণে বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইয়া লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বর্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পর্তুগীজেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিতেছিলেন। কিন্তু

তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল ; কিন্তু তখনও অনেকাংশে শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।" [৩৬]

সপ্তগ্রামের অতীত গৌরবকথা বলতে গিয়ে ('এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত।') বঙ্কিমচন্দ্র স্টুয়ার্টের History of Bengal -এর সহায়তা নিয়েছেন। পাদটীকায় স্টুয়ার্ট লিখেছেন — "Saatgong was known to the Romans, by the names of Ganges Regia. It is a famous place of worship, and was formerly the residence of the Kings of the country, and said to have been of an immense size." [৩৭]

সপ্তগ্রামে 'ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস' এবং তার 'শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছেন তা' স্টুয়ার্টের ইতিহাস থেকেই নেওয়া। স্টুয়ার্ট লিখেছেন — "A regular Foujedar was appointed from Court, who in the process of time, was made independent of the governor; and all the public officers were withdrawn from Saatgong, which soon declined into a mean village, now known to Europeans." [৩৮]

প্রকৃতপক্ষে সপ্তগ্রাম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আর যা বলেছেন, তা রেনেলের গ্রন্থ থেকে History of Bengal-এ স্টুয়ার্ট কর্তৃক উদ্ধৃত আছে। সেখানে বলা হয়েছে — "Saatgong or Sattagong, now an inconsiderable villave, on a small creek of the Hooghly river, about four miles to the north-west of Hooghly, was, in 1556, and probably the European merchants had their factories. At that time Saatgong river was capable of

bearing small Vessels, and I suspect that its then course, after passing Saatgong, was by way of Adaumpore, Omptah and Tamlook." [৩৯]

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আমরা হতশ্রী মান্দারণ গ্রাম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘশ্বাস শুনছিলাম, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও আমরা হতশ্রী সপ্তগ্রাম সম্পর্কে তেমনি দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই (পূর্বকালে, সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধশালী নগর ছিল)। লুপ্ত গৌরব সম্পর্কে বেদনাবোধ এবং দীর্ঘশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে তাঁর ইতিহাস চেতনাকে প্রভাবিত করেছে।

সূত্র – নির্দেশ

১। Richard Burn (ed.) – The Cambridge History of India, Vol.IV, 1963, p.159.

২। যদুনাথ সরকার – ঐতিহাসিক ভূমিকা, দুর্গেশনন্দিনী, ১৩৫৮, পৃঃ ৬।

৩। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত - 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র', ১৯৬৪, পৃঃ ১০৬–৭।

৪। Charles Stewart History of Bengal, 1904, p.205.

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিমরচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

৭। যদুনাথ সরকার – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ - ৯।

৮। S.Roy — Akbar; The History and Culture of of the Indian people, Vol.VII, Ed. by R.C.Majumder, 1984, p.152.

৯। যদুনাথ সরকার – মধ্যযুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের মশলা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৭, পৃঃ ২৩৬।

১০। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.206.

১১। S.Roy — Ibid, p.141.

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৭।

১৩। প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত – উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, ১৩৬৮, পৃঃ ৫০।

১৪। যদুনাথ সরকার – ঐতিহাসিক ভূমিকা, দুর্গেশনন্দিনী, ১৩৫৮, পৃঃ ১১।

১৫। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.206.

১৬। S.Roy — Ibid, p.152.

১৭। Abul Fazal — Akbarnama, Vol.III, Trn. by A.Baveridge,1939, p.879.

১৮। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.206.

১৯। Charles Stewart — Ibid, p.206.

২০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খন্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬১।

২১। যদুনাথ সরকার – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬ - ৮।

২২। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এ 'আফগান বা পাঠান জাতি' নামক প্রবন্ধে পাঠানদের অতিথি পরায়ণতা, স্বদেশানুরাগ, স্বাধীনতাপ্রীতি প্রভৃতি নানা গুণের প্রশংসা আছে। খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি পাঠ করে সে কালের পাঠানদের জাতিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্য অবগত হন এবং তার সহায়তায় ওসমান চরিত্র পরিকল্পনা করেন।

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দুর্গেশনন্দিনী, দ্বিতীয় খন্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬১।

২৪। বিজিত কুমার দত্ত – বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, পৃঃ ৭৬–৭৭।

২৫। L.S.S.O.Malley — Bengal District Gazetters : Hooghly, 1912, p.288-89.

২৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দুর্গেশনন্দিনী, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ৭–৮।

২৭। বিজিত কুমার দত্ত — প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৭।

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কপালকুণ্ডলা, প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ৮৫।

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫।

৩০। মুকুন্দরামচক্রবর্তী — কবিকঙ্কন চণ্ডী (২য় ভাগ), ১৯২৬, পৃ: ১৫৪।

৩১। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ১৩৮৫, পৃ: ২২১–২২।

৩২। Richard Burn (ed.) — The Cambridge History of India, Vol. IV, 1963, p.160.

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কপালকুণ্ডলা, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ১১৪।

৩৪। R.C.Majumder & Others — An Advanced History of India, 1981, p.459.

৩৫। Beni Prasad — History of Jahangir, 1962, p.163.

৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কপালকুণ্ডলা, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃ: ১০৭।

৩৭। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.275.

৩৮। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.275.

৩৯। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.273.

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাস চেতনার পদসঞ্চার

(মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয় ও চন্দ্রশেখর)

॥ মৃণালিনী ॥

দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় ইতিহাস উপন্যাসের রোমান্টিক পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ; ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের বিশেষ কোন ভাব বা ভাবনা সেখানে যুক্ত নয়। কিন্তু মৃণালিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস–চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বদেশ–চিন্তা। যা পরবর্তী উপন্যাস - সমূহে বিশেষত আনন্দমঠ ও সীতারামে প্রসারতা পেয়েছে। ড: ভবতোষ দত্ত বলেছেন – '' মৃণালিনী (১৮৬৯) রচনাকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন ইতিহাস–সন্ধানী মন জেগে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা বর্ণনায়। এ বর্ণনা নিশ্চয়ই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধ শিলালিপির বিবরণ, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, কৌটিল্য ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত।'' [১]

মৃণালিনী উপন্যাস বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গজয়ের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা হয়েছে এই ভাবে — হেমচন্দ্র দিল্লী থেকে বখ্‌তিয়ার খিলজির বঙ্গ জয়ের উদ্যোগ–সংবাদ সংগ্রহ করে ফেরার পথে মথুরাতে মৃণালিনীর দেখা না পেয়ে, ক্ষুব্ধ হয়ে, মাধবাচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন। হেমচন্দ্রের কাছে সংবাদ পেয়ে মাধবাচার্য রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছে নিবেদন করলেন যে, যবনেরা গৌড় অধিকার করতে আসছে সুতরাং ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা তাঁর অসামর্থ্যের কথা জানালেন এবং রাজ–সভাপণ্ডিত বললেন যে, শাস্ত্রে লেখা আছে যে তুরকীয়েরা গৌড়–জয় করবে। মাধবাচার্যের চেষ্টা বিফল হল।

যথা সময়ে বখ্‌তিয়ারের 'সপ্তদশ অশ্বারোহী'র দ্বারা রাজপুরী অতর্কিতে আক্রান্ত হল। যবনেরা পুরমধ্যে যাকে যেখানে পেল হত্যা করতে লাগল। বৃদ্ধ রাজা তখন আহারে বসেছিলেন। কোলাহল শুনে বিচলিত হলেন। এমন সময় সংবাদ এল যে, যবনেরা রাজ-

পুরীর অন্য সকলকে হত্যা করে বৃদ্ধ রাজাকে বধ করতে আসছে। এই সংবাদ শুনে বৃদ্ধ রাজার 'মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ' করে খিড়কি দরজা দিয়ে সুবর্ণগ্রামে পালালেন। তখন " মোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।" [২] এবং " সেইদিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ জয় সম্পন্ন হইল।" [৩]

লক্ষ করার বিষয় এই যে, 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সচেতন ভাবেই বখ্‌তিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গজয়ের কথা বলেন নি। এই উপন্যাসে সপ্তদশ অশ্বারোহীর 'গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার' এবং 'বিংশতি সহস্র যবন' সেনার নবদ্বীপ জয়ের কথা বলা হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে যিনি সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীর প্রতিবাদ করে লিখবেন যে, " সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল । ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন।" [৪] এবং " বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করে নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।" [৫] তার বীজ মৃণালিনী উপন্যাসেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়।

তুর্কীদের বাংলাজয়ের সর্বপ্রাচীন বিবরণ আমরা পাই মিনহাজউদ্দীন রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সে বিবরণের যে সারমর্ম দিয়েছেন তা' নিম্নরূপ :-

" বখ্‌তিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পরে তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি নুদীয়ায় পৌঁছিল। দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বলিলেন, 'শাস্ত্রে লেখা আছে, তুরস্কেরা এ দেশ জয় করিবে, এবং তাহার কাল উপস্থিত সুতরাং অবিলম্বে পলায়ন করাই সঙ্গত।' রাজার প্রশ্নোত্তরে তাঁহারা জানাইলেন যে, এই তুর্কী বিজয়ীর চেহারা কিরূপ, তাহাও শাস্ত্রে লেখা আছে। গুপ্তচর পাঠাইয়া বখ্‌তিয়ারের আকৃতির বিবরণ আনান হইলে দেখা গেল যে, শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তখন বহু ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ নুদীয়া হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু রাজা লখমনিয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

ইহার এক বছর পরে বখ্‌তিয়ার একদল সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বিহার হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি এরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, যখন অতর্কিত ভাবে তিনি সহসা নুদীয়া পৌঁছিলেন, তখন মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারিয়াছিল ; বাকী সৈন্যদল পশ্চাতে আসিতেছিল। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বখ্‌তিয়ার কাহাকেও কিছু না বলিয়া এমন ধীরেসুস্থে সঙ্গিগণসহ সহরে প্রবেশ করিলেন যে, লোকেরা মনে করিল, সম্ভবত ইহারা একদল অশ্বব্যবসায়ী, অশ্ববিক্রয় করিতে আসিয়াছে। বখ্‌তিয়ার যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন বৃদ্ধ রাজা লখমনিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছিলেন। সহসা প্রাসাদদ্বার এবং নগরীর অভ্যন্তর হইতে তুমুল কলরব শোনা গেল। লখমনিয়া এই কলরবের প্রকৃত কারণ জানিবার পূর্বেই বখতিয়ার সদলে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজার অনুচরগণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। বখ্‌তিয়ারের সমুদয় সেনা নুদীয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ নগরী ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান সমুদায় অধিকার করিল এবং বখতিয়ারও সেখানেই বসতি স্থাপন করিলেন। ওদিকে রায় লখমনিয়া সুবর্ণগ্রাম ও বঙ্গের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় অল্পদিন পরেই তাঁহার রাজত্ব শেষ হইল, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ এখনও বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছেন।" [৬]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মিনহাজের ইতিহাস পাঠ করে 'মৃণালিনী' উপন্যাস রচনা করেন নি। কারণ, মিনহাজের ইতিহাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।

'মৃণালিনী' তার অনেক আগেই রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর ঐতিহাসিক অংশের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন স্টুয়ার্টের History of Bengal থেকে। যদিও স্টুয়ার্টেরও ভিত্তি ছিলেন মিনহাজ। স্টুয়ার্ট লিখেছেন --

"In the 599th year of the Hejira, the Mohammedans having conquered the province of Behar, and extended their ravages to the borders of Bengal, the Brahmans and astrologers waited on the Raja (i.e. Raja Luchmunyah), and represented that their ancient books contained a prophecy that the Kingdom of Bengal should be subdued by the Toorks; that they were convinced the appointed time was now arrived; and adviced him to remove his wealth, family and seat of government (then at Nuddeah), to a more secure and distant part of the country, where they might be safe from sudden incursion of their enemies.

The Raja, on hearing this representation, asked the Brahmans if their books gave any description of the person who was to be conqueror of his dominions. They replied in the affirmative, and, that the description exactly corresponded with the person of the Mohammedan General then in Behar (Mohammed Bukhtyar Khulijy).

The Raja, being far advanced in years, and partial to his capital, would not listen to their advice, and took no measures to avoid the danger ....

In the year 600, Mohammed Nukhtyar Khulijy, having acquired sufficient information of the unguarded stale of Bengal, secretly assembled his troops; and marching from Behar, proceeded with

such expedition towards Nuddeah, that his approach was not even suspected.

On his arrival in the Vicnity of the city, he concealed his troops in a wood, and, accompained by only seventeen horsemen, entered the city. On passing the guards, he informed them that he was an envoy, going to pay his respects to their master.

He was thus permitted to approach the place; and having passed the gates, he and his party drew their swords, and commenced a slaughter of the royal attendants.

The Raja Luchmunyah, who was then seated at diner alarmed by the cries of his people made his escape from the palace by a private door, and, getting on board a small boat, rowed with the utmost expedition down the river.

The remainder of the Mohammedan troops now advanced, and, having slanghtered a number of the Hindoos, took possession of the city and palace." [৭]

তুর্কীরা বঙ্গবিজয় করবে — এই শাস্ত্রবাক্য বিষয়ে মিনহাজ এবং মিনহাজ অনুসারী স্টুয়ার্টের বর্ণনায় স্বাভাবিক ভাবেই মিল আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও 'মৃণালিনী' উপন্যাসে এই শাস্ত্রবাক্য বিষয়ে স্টুয়ার্টের বর্ণনার অনুসরণ করেছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)। তবে কোন কোন বিষয়ে মিনহাজের বর্ণনার সঙ্গে স্টুয়ার্টের বর্ণনার কিছু পার্থক্যও আছে। যেমন, মিনহাজ লিখেছেন যে, বখতিয়ার এত দ্রুত বিহার থেকে নদীয়ায় আসেন যে, তাঁকে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী অনুসরণ করতে পারে এবং তারা অশ্ববিক্রেতার পরিচয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করে। আর স্টুয়ার্ট লিখেছেন যে বখতিয়ার তার সেনাবাহিনীকে এক অরণ্যমধ্যে লুকিয়ে রেখে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী সহ রাজপ্রতিনিধির দূত হিসাবে নদীয়ায়

প্রবেশ করে। স্টুয়ার্টের অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীর দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে মহাবনে যবন সৈন্যের শিবির স্থাপনের কথা যেমন বলেছেন তেমনি উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সপ্তদশ অশ্বারোহীর রাজদ্বারে উপনীত হয়ে দৌবারিকের কাছে নিজেদের যবন-রাজপ্রতিনিধির দূত পরিচয় গৌড়েশ্বরের সাক্ষাৎ প্রার্থনার কথাও বলেছেন।

কিন্তু " বখতিয়ার খিলিজি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সহ বঙ্গদেশ জয় করেন, এই কাহিনী বা গল্প বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালী জাতির শৌর্য-বীর্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। উক্ত জাতীয় কলঙ্ক বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।"[৮] সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয় - কাহিনী সম্পর্কে 'মৃণালিনী' উপন্যাসে তিনি মন্তব্য করেছেন — " অষ্ট বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে ? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।" [৯] ঠিক একই বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্রও বলেছেন — " নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।" [১০] সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরাও সংশয় প্রকাশ করেছেন।[১১]

সম্ভবত ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নদীয়া আক্রমন করেন। এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে মিনহাজ লক্ষ্মণাবতী নগরে এসে দু'জন মগধ অভিযানকারী বৃদ্ধ সৈনিকের মুখ থেকে বখতিয়ারের মগধ অভিযান ও বিজয় কাহিনী শুনে তা লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু বখতিয়ারের সঙ্গে নদীয়া অভিযানে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির

বিবরণ মিনহাজ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তিনি বখ্‌তিয়ারের নদীয়া অভিযান বিষয়ে কোনো নিশ্চিত বিবরণ বা দলিলও সংগ্রহ করতে পারেন নি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, আজ পর্যন্তও তেমন কোন দলিল সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। মিনহাজের রচনাই আমাদের এক-মাত্র ভরসা। মিনহাজ জানিয়েছেন যে, বখ্‌তিয়ারের নদীয়া অভিযান ও বিজয়কাহিনী তিনি বিশ্বাসী লোকেদের কাছ থেকে শুনেছিলেন।

এই বিশ্বাসী লোকেরা মিনহাজকে রাজা লক্ষ্মণসেনের জন্ম বিষয়ে এক অদ্ভুত কাহিনীও শুনিয়েছিলেন। তাদের কাহিনী অনুসারে, লক্ষ্মণসেন, তাঁর পিতার মৃত্যুর সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁর জন্মকাল উপস্থিত হলে দৈবজ্ঞরা গণনা করে বললেন যে, যদি এই শিশুর এখনই জন্ম হয়, তবে সে কখনই রাজা হবে না, কিন্তু আর দুই ঘন্টা পরে জন্মালে সে আশি বছর রাজত্ব করবে। এই কথা শুনে রাজমাতার নিজের আদেশ অনুসারে, তাঁর দু'পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে করে তাঁকে ঝুলিয়ে রাখা হল। শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে তাঁকে নামান হয়, কিন্তু পুত্র প্রসবের পরেই তার মৃত্যু হল। রায় লখমনিয়া আশি বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং হিন্দুস্থানের এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। [১২]

যে বিশ্বাসী লোকেরা মিনহাজকে অষ্টাদশ অশ্বারোহী সহযোগে বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় কাহিনী শুনিয়েছিল তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমান কতটা ছিল তা আমরা লক্ষ্মণসেনের অদ্ভুত জন্ম কাহিনী ও আশি বছর রাজত্ব করার কথা থেকেই অনুমান করতে পারি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, মিনহাজ কথিত অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বখতিয়ারের বঙ্গবিজয় "কাহিনীর মধ্যে অনেক সুপরিচিত প্রবাদ কথা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ আছে। 'তুরস্ক আক্রমণ সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্ত্রবাণী' চচ্‌নামা নামক গ্রন্থে সিন্ধুদেশ সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রবাণীর মূল যাহাই হউক, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নদীয়া আক্রমণের অন্তত এক বৎসর পূর্বে ইহার সম্ভাবনা রাজকর্মচারীরা জ্ঞাত ছিলেন। অথচ বখতিয়ার বিহার হইতে নদীয়া পৌঁছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার অভিযানের কোন সংবাদ রাজদরবারে পৌঁছিল না। যে সময় তুরস্কসেনা কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেই সময় রাজধানীর দ্বাররক্ষীরা ১৮জন অশ্বারোহী তুর্কীকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতে দিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বর্মাবৃত সৈন্যকে অশ্বব্যবসায়ী বলিয়া ভুল করিল ; নগররক্ষীরা কোন সন্দেহ করিল না এবং বখতিয়ার বিনা বাধায়

রাজপ্রাসাদের তোরণ পর্যন্ত পৌঁছিলেন। যখন বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যদল নগরে প্রবেশ করিল, তখনও এই অগ্রগামী ১৮ জন অশ্বারোহীকে সন্দেহ করিয়া কেহ তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না। রাজার দেহরক্ষী বা সৈন্যদল অবশ্যই ছিল। যখন রাজা স্বয়ং নদীয়াতে ছিলেন, তখন অন্তত একদল রাজসৈন্য নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল, অথচ বখতিয়ারের সৈন্যদলের কাহারও গায়ে একটি আচড়ও লাগিল না, তাহারা স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় হত্যাকান্ড ও লুণ্ঠন কার্য চালাইতে লাগিল। এ সমুদয় এতই অস্বাভাবিক যে, খুব দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত সত্য বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব।" [১৩]

তবে এই অসম্ভব কাজ কি ভাবে সম্ভব হল সে সংক্রান্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য আজও আমাদের অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — " বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না ; চাতুর্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয় স্থান।" [১৪] পরবর্তীকালে, প্রসঙ্গক্রমে, অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখেছেন যে, — "বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গ সেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাস মাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধজয় হয় নাই। একটা রঙ তামাশা হইয়াছিল।" [১৫] নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে প্রকৃত অর্থে রঙ–তামাশা হয়েছিল। কারণ, না হলে মাত্র তিন হাজার একশ সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ নবাব সিরাজদ্দৌলার ৫০টি কামান এবং ৫০ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন না। [১৬]

এই অসম্ভব যুদ্ধজয় আমরা সত্য বলে স্বীকার করি, কারণ, এর পিছনে খুব দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। কিন্তু সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গ–জয়ের কাহিনীর পিছনে খুব দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। অথচ সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক নদীয়া আক্রমণ ও লুণ্ঠনকে অস্বীকার করা যায় না। তাই 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মিনহাজের অনুসারী স্টুয়ার্টের বর্ণনাকে অবিকৃত রেখে সপ্তদশ অশ্বারোহী পাঠান সেনা কর্তৃক বঙ্গ–জয়ের কাহিনীর নেপথ্যে 'দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর রূপে কথিত', গৌড়দেশের ধর্মাধিকার, অসাধারণ ব্যক্তি-

পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতারূপ কাহিনীর কল্পনা যুক্ত করেছেন। এর ফলে একটি ঐতিহাসিক তথ্যের অসম্পূর্ণতা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ঐশ্বর্য্যে বিশ্বাসযোগ্য পূর্ণতা লাভ করেছে।

এই উপন্যাসের প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক নিন্দিত 'রাজকুল-কলঙ্ক' রাজা লক্ষ্মণসেন। তিনি, তাঁর পিতা, রাজা বল্লালসেনের ইচ্ছাক্রমে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। সে সময়ে লক্ষ্মণসেনের বয়স ৬০ বছর। যৌবনে তিনি মহা-পরাক্রান্ত বীরযোদ্ধা এবং রণকুশল সমরনায়ক ছিলেন। পিতামহ বিজয়সেনের আমলেই তিনি কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন। পিতার রাজত্বকালে তিনি গৌড় রাজ্য সম্পূর্ণরূপে সেন রাজাদের অধিকারে আনেন। সিংহাসনারোহণের পর তিনি গাহড়বাল রাজকে পরাজিত করে গয়া অধিকার করেন এবং কাশীরাজাকে পরাজিত করে কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনি বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে সারা জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপালের পরে বাংলাদেশের আর কোনো রাজা লক্ষ্মণসেনের মত যুদ্ধ সাফল্য লাভ করেন নি। লক্ষ্মণসেন নিজে সুকবি ও বিদ্বান ছিলেন। জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ করিয়া তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর মহাপরাক্রমে রাজত্ব করার পর প্রায় ৮০ বছর বয়সে বৃদ্ধরাজা গঙ্গাতীরে ধর্মচর্চার মানসে নবদ্বীপে বসবাস শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই মুসলমান আক্রমণ হয়। নবদ্বীপ থেকে পলায়ন করার পর বৃদ্ধরাজা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ধ্রুব সম্ভব ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

'মৃণালিনী' রচনার সময় থেকেই 'মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি'র জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে ব্যাকুলতার জন্ম নিয়েছিল। 'মৃণালিনী' রচনার পর তিনি গভীর ভাবে ইতিহাস পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। একদা কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে বলেছিলেন — "মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি।" [১৭] বাংলার ইতিহাসহীনতার জন্য তাঁর অন্তরে গভীর বেদনা ছিল এবং বাংলার ইতিহাসহীনতার কলঙ্কমোচনের জন্য তিনি 'শস্ত্রহস্ত' থেকে 'চিত্রফলক' আপন হাতে তুলে নেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিম-চন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং প্রথম সংখ্যা থেকেই ইতিহাস

বিষয়ক প্রবন্ধ পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মিনহাজ-উদ্দীন কথিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ-জয়ের কাহিনী বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বঙ্গ-বিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র কোন বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয় নাই, 'বাভার্টি'র অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট্ কর্তৃক প্রকাশিত 'তাজ-উল-মাসি'র ও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র সারাংশ মাত্রই এতদ্দেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিম-চন্দ্র বাঙ্গালার মুসলমান বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।" [১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা' স্বদেশানুরাগের তুলিকায় রঞ্জিত। মৃণালিনী উপন্যাসেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগের প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করি। 'মৃণালিনী' রচনার কিছুকাল আগে থেকেই বাঙ্গালাদেশে, বাঙালির মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ দেখা যাচ্ছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলায় স্বদেশচর্চার বীজটি প্রথম অঙ্কুরিত হতে দেখা গেল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বেল-গাছিয়ায় সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এ সবের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু তিনি খুব সম্ভব মনে মনে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হল। ইতিহাসের তথ্যানুসারে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদের হাতে বাংলার পরাজয়ের কথা লিখলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন — "যে সূর্য্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত' স্বাভাবিক নিয়ম।" [১৯] বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যই 'মৃণালিনী'কে স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশিষ্ট করেছে।

॥ যুগলাঙ্গুরীয় ॥

'বঙ্কিম-জীবনী'র রচয়িতা শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন — " তাম্রলিপ্তের ঘটনা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায় পনর বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুকে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তমলুকের ম্যাজিস্ট্রেট। তমলুক পূর্বে যখন তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত ছিল, তখন সমুদ্র তমলুকের পদধৌত করিত।

এক্ষণে সমুদ্র অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। সমুদ্র গিয়াছে, রূপনারায়ণ আসিয়াছে। কোথা হইতে কবে এ বিপুলকায় নদ আসিয়া তমলুকের পদনিম্নে গ্রহণ করিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে আসিলেন, তখন তমলুকে সে বাণিজ্য নাই, সে শ্রী নাই ; কিন্তু স্মৃতি আছে।" [২০]

'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রী ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু তবু যুগলাঙ্গুরীয়কে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার কারণ, প্রথমতঃ এর কাহিনী দূর অতীতের - খুব সম্ভব খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের আগের। দ্বিতীয়তঃ এ কাহিনীর কেন্দ্রভূমিতে আছে প্রাচীন বাংলার অতি-বিখ্যাত সমুদ্র-বন্দর 'তাম্রলিপ্ত'।

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় তাম্রলিপ্তের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন — " বাংলাদেশের প্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি ; সেই তাম্রলিপ্তি বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, পুঁথির পাতায় পাতায়। সপ্তম শতকে যুয়ান চোয়াঙ্ ও ইৎ-সিঙ্ তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লেখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না।" [২১]

যুগলাঙ্গুরীয়তে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে তাম্রলিপ্তে শ্রেষ্ঠীদের বসবাসের কথা, তাদের বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রার কথা, সমুদ্রতীরবর্তী সুনির্মিত বৃক্ষবাটিকার কথা,

অপূর্বদর্শন মহাপ্রভাযুক্ত হীরক হারের কথা বলেছেন তাতে এই কাহিনী তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির সময়ের অর্থাৎ অষ্টম শতকের আগের কাহিনী বলেই মনে হয়। রাজ্যে সুশাসন ও শান্তি ভিন্ন বাণিজ্যে সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। যুগলাঙ্গুরীয়ের কালে তাম্রলিপ্তে সুশাসন ও শান্তি বিরাজিত। রাজা কেবল বীর্যবান নন ; বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় — " রাজা পরম ধার্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে পারে না।" [২২]

যোগেশ চন্দ্র বসু তাঁর 'বঙ্কিম স্মৃতি চিহ্ন' গ্রন্থে লিখেছেন — " বাঙালীর বাণিজ্যপোত সেদিন কত দেশের রত্ন ভান্ডার স্বদেশে বহন করিয়া আনিত। তাম্রলিপ্তের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় শত সৌধচূড়ায় সে বিভবচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া বাঙালীর পুরুষকার ঘোষণা করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসে, তাম্রলিপ্তের সেই গৌরবময় যুগের এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ও এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার প্রণয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" [২৩]

বঙ্কিমচন্দ্র যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রভূমি হিসাবে 'তাম্রলিপ্ত' বন্দরকে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই নির্বাচন করেছে এবং তাঁর এই সচেতনতা যুগলাঙ্গুরীয়ের কাহিনী সূচনাতেই তাম্রলিপ্ত বন্দর সম্পর্কে পাদটীকা প্রদান করে স্পষ্ট করেছেন। তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে তিনি পাদটীকায় লিখেছেন — " আধুনিক তামলুক। পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, পূর্বকালে এই নগর সমুদ্রতীরবর্তী ছিল।" [২৪]

'তাম্রলিপ্ত' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের 'মান্দারণ' গ্রাম এবং 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'সপ্তগ্রাম' এর কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। যাদের অতীত সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র একদা দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন। তাম্রলিপ্তের ইতিহাস ও সমৃদ্ধির - গৌরব মান্দারণ ও সপ্তগ্রাম অপেক্ষা প্রাচীন ও উজ্জ্বল। সুতরাং তাম্রলিপ্তকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে দুর্বলতার জন্ম হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের মনে হয়, যুগলাঙ্গুরীয় যেন এক সুবৃহৎ উপন্যাসের খসড়া মাত্র। এই উপন্যাসের খসড়া মাত্র। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সম্ভব বীর্যবান, সংকল্পে দৃঢ়, নৌ–বিদ্যায় দক্ষ এবং ব্যবসা–বাণিজ্যে সমৃদ্ধ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির এক ঐশ্বর্য্যোজ্জ্বল রূপ আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়নি।

॥ চন্দ্রশেখর ॥

চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হবার সময় উপন্যাসের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন — " ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 'সয়ের-উল-মতাক্ষরীন' নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে ; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।" [২৫] " বঙ্কিমচন্দ্র যে এই গ্রন্থ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তা' রামদাস সেনের গ্রন্থাগারের সয়ের মতাক্ষরীণ গ্রন্থ দেখলেই বোঝা যায়।" [২৬]

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দুটি সমান্তরাল কাহিনী আছে, — একটি প্রতাপ – শৈবলিনী – চন্দ্রশেখর কাহিনী, অপরটি মীরকাসেম - দলনী - গুরগণ খাঁ কাহিনী। একটির বিষয় কাল্পনিক, অপরটি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক অংশের নায়ক বাংলার নবাব মীরকাসেম।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, সুবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি, নবাব আলিজা, মীরকাসেম খাঁ, মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙমহলে, আপন প্রিয়তমা বেগম দলনীকে জানিয়েছেন যে, তাঁর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ অনিবার্য। এই যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করতে তিনি দলনীকে বলেছেন — " .... ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই।" [২৭] মীরকাসেমের এই বক্তব্য ঐতিহাসিক সত্য।

মীরকাসেম ইংরেজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের অনিবার্যতাকে দলনীর কাছে আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেছেন — " যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, " রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব ? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব — অনর্থক কেন পাপ ও

কলঙ্কের ভাগী হইব। ? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি — বা মীরজাফরও নহি।" [২৮]
মীরকাসেমের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন — "The new Nawab (Mir-Kashim) was very different man from his father-in-law. Able and ambitious, though suspicious and unwarlike he was adept in the cyhical and pitiless politics of the time, and determined to assert his indipendence at the earliest opportunity." [২৯]

মীরকাসেম কেবল স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়চরিত্রের মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথার্থ প্রজানুরঞ্জক রাজা। স্বাধীন ভাবে নবাবী করে তিনি প্রজার মঙ্গল-সাধন করতে চেয়েছিলেন ; ইংরেজের দৌরাত্ম্য করে প্রজাপীড়নকে তিনি অধর্ম মনে করতেন। এই কারণেই ইংরেজের সঙ্গে মীরকাসেমের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এখন মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা' আমরা উদ্ধৃত করছি —

"By an imperial firman the English Company enjoyed the right of trading in Bengal without the payment of transit dues or tolls. But the servants of the company also claimed the same privileges for their private trade. The Nawabs had always protested against this abuse, but the members of the council being materially interested, the practice went on increasing till it formed a subject of serious dispute between Mir Kasim and the English. At last towards the end of 1762 Vansittart met Mir Kasim at Monghyr, where the Nawab had removed his capital, and concluded a definite agreement on the subject. The council at Calcutta, however, rejected the agreement. Thereupon the Nawab decided to abolish the duties altogether; but the English clamoured against this and insisted upon having preferential treatment as against other traders. Ellis, the chief of the English factory at Patna,

violently asserted what he considered to be the rights privileges of the English and even made an attempt to seize the City of Patna. The attempt failed and his garrison was destroyed, but the events led to the out break of war between the English and Mir Kasim (1763)." [৩০]

বঙ্কিমচন্দ্র যে 'সয়ের মুতাক্ষরীন' গ্রন্থটি অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই তখন, যখন দেখি যে, দলনী বেগমের অনুরোধে যুদ্ধের সময় দলনী বেগম কোথায় থাকবেন তা জানবার জন্য নবাব মীরকাসেম জ্যোতিষ মতে গণনা করছেন। মুতাক্ষরীনে বলা হয়েছে যে, মীরকাসেম জ্যোতিষশাস্ত্রে কিঞ্চিৎপারদর্শী ছিলেন এবং এই শাস্ত্রে তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল।[৩১]

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের, প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে, পরিচারিকা কুলসম্ দলনী বেগমকে সংবাদ দিল যে, গুরগণ খাঁ ইংরেজদের দু'টি অস্ত্র-বোঝাই নৌকা আটক করেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদের আশঙ্কায় ইব্রাহিম খাঁ নৌকা ছেড়ে দিতে বলছেন, কিন্তু গুরগণ খাঁ বলছেন, লড়াই বাধে বাধুক নৌকা ছাড়ব না। নৌকা আটকের এই ঘটনা ইতিহাস সম্মত। ইতিহাসে আছে — ".... Gurghin Qhan wanted to stop, whilst Mr.Amyat insisted upon the boat's being dismissed without being stopped or even searched; and to that forbearance the court would not listen, Aaly Ibrahim-Qhan objected to the boats being stopped or visited at all. He contended, that if peace was in contemplation, there was no colour for stopping the boat." [৩২]

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁর পরিচয় বিবৃত করে বলেছেন — " এই সময় বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরগণ খাঁ একজন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আর্মাণি ; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান ; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বণিকবিশেষ ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে প্রধান

সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রধানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল ; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমত ভরসা ছিল যে, তিনি গুরগণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুরগণ খাঁর আধিপত্যও তদনুরূপ হইয়া উঠিল ; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না ; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুরগণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।"[৩৩]

উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁর কেবল বাইরের পরিচয়ই নয় ; তার অন্তরের পরিচয়ও দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন গুরগণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'এখন কোন্ পথে যাই ? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্রবিশেষ – যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গুণিলে কি হইবে ? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম — এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষে অস্থির। আমিই বাঙ্গালার কর্ত্তা। আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা ? কে কর্ত্তা ? কর্ত্তা ইংরেজ বণিক — তাহাদের গোলাম মীরকাসেম ; আমি মীরকাসেমের গোলাম — আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম। বড় উচ্চপদ। আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা না হই কেন ? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? ইংরেজ। একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি — মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না – যে দিন মনে করিব, সেই দিন উহাকে মসনদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদ আরোহণের সোপান — এখন ছাদে উঠিয়াছি – মই ফেলিয়া দিতে পারি। কণ্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে – আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাহাদের তাড়াইব। এখন মীরকাসেম মস্নদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ।"[৩৪]

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে, গুরগণ খাঁ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য। সয়ের মুতাক্ষরীণে তেমন বর্ণনাই আছে। মুতাক্ষরীণ বলে ".... an Qhadja bedross was put at the head of the artillery, with orders to new-model it after the European fashion; and likewise to discipline the musqueteers in his (Mir Cassem Qhan's) service after the English manner." [৩৫]

গুরগণ আপন দক্ষতায় সেনাবাহিনীর প্রধান হয় এবং সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করে ইংরেজ বাহিনীর তুল্য করলে নবাব মীরকাসেম গুরগণের অনুগত হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে মুতক্ষরীণের অনুত্র বলা হয়েছে যে, "Gurghinqhan, the Armenian .... was the Principal General of his troops, and the trusty confident of his heart; nay, the Nawab seemed to have sold himself to him totally." [৩৬] ফলতঃ ক্রমশ গুরগণ খাঁ একটি ক্ষুদে নবাব হয়ে ওঠেন। গুরগণ খাঁর এই প্রতিপত্তিতে অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল আলি ইব্রাহিম খাঁর একটি চিঠিতে তার পরিচয় আছে। আমরা চিঠিটির ইংরেজী অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃতি করছি —

"Since the advice and counsels offered your well-wishers, and which your mind approves, never fail in the evening to be obliterated by Gurghin-qhan's suggestions, it is needless that either your Highness, or your friends and well-wishers, should fatigue themselves any more upon an infructuous subject; for in the end, we shall find nothing is done, but what has been adviced by Gurghin qhan .... Let us all do as he shall did, ... it is but what happens everyday." [৩৭]

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে গুরগণ খাঁর যে পরিচয় দিয়েছেন তা' মূলতঃ সয়ের মুতাক্ষরীণ অনুসারে। গুরগণ খাঁ অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য নিয়মিত ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এ সংবাদ

নবাবের কর্ণগোচর হলে গুরগণ খাঁকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। মুতাফরীণ নবাবের বিরুদ্ধে গুরগণ খাঁর গোপন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে ; — The causes, which no one dared to mention, are a conspiracy, said to be brewing by Gurghin-ghan, incited underhand by the English". ৩৮

এ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন — " মীরকাসিমের একান্ত বিশ্বাসভাজন খোজা গ্রেগরী ওরফে গর্গিন খাঁ যে সত্য সত্যই ইংরেজদিগের সহায়তা সাধন করিয়াছিলেন, মেজর আদমস যখন কলিকাতায় তাঁহার হত্যার সংবাদ প্রেরণ করেন, তৎকালে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।" ৩৯

মীরকাসেম অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নবাব ছিলেন। " ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জগৎ শেঠ তাঁহাদিগকে পূর্ণ সহায়তা করিতেছেন। এই সময়ে জগৎ শেঠ মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে ও জাফর আলী খাঁকে যে সমস্ত পত্র লেখেন, তাহার কতকগুলি মীরকাশিমের হস্তগত হয়। এ জন্য নবাব জগৎশেঠ মহতাবচাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ পাঠান। তকী খাঁ তাঁহাদিগকে কোনরূপ অপমানিত না করিয়া হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। পরে নবাবের সেনাপতি আর্মেনীয় মার্কার নবাবের আদেশে সসৈন্যে তাঁহাদিগকে লইতে উপস্থিত হইলে, তকী খাঁ তাঁহাদিগকে মার্কারের হস্তে সমর্পণ করেন। এই সময়ে নবাব কাশেম আলি খাঁ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন। মার্কার তাঁহাদিগকে লইয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হন। নবাব শেঠদিগের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া মুঙ্গেরে একটি কুঠী স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নির্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করেন। অত:পর তিনি তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ; কিন্তু পাছে ইংরেজদিগের সহিত পুনর্বার শেঠদিগের মন্ত্রনা আরম্ভ হয়, তজ্জন্য যাহাতে তাঁহারা অধিক দূর ভ্রমণ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে স্বীয় অনুচর দিগকে সতর্ক করিয়া দেন।" ৪০

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও জগৎশেঠদের ইংরেজ ও গুরগণ খাঁর সঙ্গে গোপন মন্ত্রনাকে মীরকাসেম রোধ করতে পারেন নি। উপন্যাসের পঞ্চম খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁর সঙ্গে সুরূপচাঁদ ও মহতাবচাঁদ, জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের গোপন

ম-ত্রণার চিত্র এঁকেছেন। ড: বিজিত কুমার দত্ত বলেন — " চন্দ্রশেখর উপন্যাসে গুরগণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের রাজনীতির একটি সজীব চিত্রের অবতারণা করেছেন। জগৎ-শেঠেদের ম-ত্রনা সে যুগের ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। জগৎশেঠদের হাতে রাখতে না পারলে সে কালে কোনো নবাবই সিংহাসনকে সুরক্ষিত মনে করতেন না। গুরগণ মীরকা-শিমের সঙ্গে জগৎশেঠদের মনোমালিন্যের সুযোগ নিজের ষড়য-ত্র জাল বিস্তার করেছিল। পলাশী যুদ্ধের পর নবাব এবং নবাব অনুচরবৃন্দ সকলেই দেশের স্বার্থ অপেক্ষা আপন আপন স্বার্থ বেশী দেখেছিলেন। দেশীয় এবং বিদেশীয় সকলের সম্বন্ধেই একথা খাটে। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণের জগৎশেঠের সঙ্গে ম-ত্রনার মধ্যদিয়ে সেই অবস্থাকেই পরিস্ফুট করেছেন। "[৪১]

অবশ্যই মীরকাশেম স্বত-ত্র প্রকৃতির নবাব ছিলেন — যাঁর সঙ্গে অন্য নবাবদের তুলনা চলে না। তিনি প্রজার বৃহত্তর কল্যাণের প্রত্যাশী ছিলেন, এবং সে কারণে ইংরেজ-দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। " ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাসেমের অধ:পতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুরগণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ হইল। " [৪২] " মীরকাসেমের সোনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হটিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল — আবার যবনসেনা ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলারাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতু:পার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন। মীরকাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন।" [৪৩] উদয়নালার যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়েছিল, উপন্যাসে তার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু তারপরের যুদ্ধ নবাবের উদ্যম ও অবস্থান এবং পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলা নেই।

কিন্তু চন্দ্রশেখর যখন ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন উপন্যাসের শেষ কিস্তিতে, 'পরিশিষ্ট' নামক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন — " নবাব কাসেম আলি খাঁ উদয়নালা হইতে মুঙ্গেরে পালাইলেন। তথায় জগৎ শেঠদিগকে গঙ্গা জলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। [৪৪] এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরুর হস্তে বধ করিলেন। এই সকল দুষ্কার্য করিয়া, মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুরগণ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশ ক্রমে উদয়নালা যাইবার জন্য নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয়নালা পর্যন্ত যান নাই — নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন। ভাবগতিক বুঝিয়া নবাবের সঙ্গে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথি মধ্যে নবাব সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন — বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।" [৪৫]

মীরকাসেমের ভাগ্যবিপর্যয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক লিখেছেন —

"On 10th June Major Adams took the field against Mir Kasim with about 1,100 Europeans and 400 sepoys. The Nawab assembled an army 15,000 strong, which included soldiers trained and disciplined on the European model. In spite of this disparity of numbers, the English gained successive victories at Katwah, Murshidabad, Giria, Sooty, Udaynala and Monghyr. Mir-Kasim fled to Patna, and after having killed all the English prisoners and a number of his pfominent officials, went to Oudh. There he formed a confederacy with Nawab Suja-ud-daulat and the Emperor Shah Alam II with a view to recovering Bengal from the English. The confederate army was, however defeated by the English General Major Hector Munro at Buxar on 22nd October, 1764. Shah Alam immediately joined the English Camp, and some time later concluded peace with the English. Mir-Kasim fled, and led a wandering

life till he died in obscurity, near Delhi, in A.D. 1777". [৪৬]

বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসেমকে বলেছেন বাঙ্গালার – "শেষ রাজা ; কেননা মীর-কাসেমের পর যাঁহারা নবাব নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।" [৪৭] মীরকাসেম দেশবৎসল, প্রজানুরঞ্জক এবং বিচক্ষণ নবাব ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম ও বিচক্ষণতার ফলে বাঙ্গালাদেশ নানা বিষয়ে উন্নত হয়ে উন্নত হয়ে উঠছিল।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসেমের সেনাপতি মহম্মদ তকী খাঁ-কে বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ ও পরস্ত্রীলোলুপ করে অঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই চরিত্রাঙ্কন ইতিহাস – অনুমোদিত নয়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন — " .... নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু (বঙ্কিমচন্দ্র) তকি খাঁর ন্যায় বঙ্গবাসী মুসলমান বীরের কর্তব্য, নিষ্ঠায় ও আত্মবিসর্জনের আনুপূর্বিক ইতিহাস পাঠ করিয়াও উপন্যাস রচনা করিবার সময়ে সে ঐতিহাসিক চরিত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ঢাকিয়া ফেলিয়া, তাহাকে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষের কলঙ্ক কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন।" [৪৮] অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র এই অভিযোগ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ।

তকি খাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেছেন — " মীরকাশিমের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাপতিবীরভূম প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তাঁহার নায়কের নাম মহম্মদ তকি খাঁ। সাহসে, কর্তব্যনিষ্ঠায় রণকৌশলে তকি খাঁ সকল দেশেই জনসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে তকি খাঁর ন্যায় প্রভুভক্ত মুসলমান সেনাপতি অধিক থাকিলে ইতিহাসে মুসলমানের নাম কলঙ্কলিপ্ত হইত না।" [৪৯]

মীরকাসেমের এই বিশ্বস্ত বীর সেনাপতির মৃত্যু হয় কাটোয়ার যুদ্ধে। 'সয়ের মুতাক্ষরীণ' গ্রন্থে তাঁর গৌরবময় জীবনাবসান কাহিনী সবিস্তারে কীর্তিত হয়েছে — "On the first wound he received through his shoulder, he cried out in anguish, ya, Aaly, O ! Aaly. Aaga-aly, his steward and

town-man, as well as our friend and neighbour, advice him to retreat and go back. Go back, answered he, and after that slew again this black beared to Mir-Cassem-Qhan ? Never, added he, stroking it at the same time, never. On receiving the second ball through his head, he screamed out Ya Aaly, again and fell down with this words in his mouth." [৫০] এরপর তাঁর মৃত্যু হল। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসের, ষষ্ঠখন্ডের, সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে যে ভাবে মীরকাসেমের হাতে তকি খাঁর হত্যাদৃশ্যের অবতারণা করেছেন তা' ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য নয়।

নবাব সিরাজদ্দৌলা মোহনলাল ও মীরমদন নামে দু'জন বিশ্বস্ত ও অগ্রগণ্য সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু মীর কাসেমের তেমন সেনানায়ক ছিলেন মাত্র একজন — মহম্মদ তকি খাঁ। কাটোয়ার যুদ্ধে তকির মৃত্যু নাহলে ইংরেজের বিজয় হত না, আর তকি খাঁ জীবিত থাকলে গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাসেমের পরাজয় হত না। গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাসেমের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বলেছেন —
"It want but one man, a skill full leader, such a man as the Mohammad Taky Khan whom they had lost at Katwa, to make success, humanly speaking absolutely certain. ...." [৫১]

আমরা আগেই বলেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সয়ের মুতাফরীণ' গ্রন্থটি অত্যন্ত খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তকি খাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনকথা তাঁর অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তবু কেন তিনি তকি খাঁকে কলঙ্কিত করলেন তার সঠিক কারণ ব্যাখ্যার অযোগ্য। অথচ অপরাপর চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিকতা বজায় রেখেছেন। যেমন আলি ইব্রাহিম খাঁ সম্পর্কে ইতিহাস বলে — তিনি মীরকাসেমের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত সেনাপতিছিলেন — ".... Old brave and loyal officer,

Ali Ibrahim Khan, who clang to his old master with fidelity uncommon in those treacherous days." [৫২] উপন্যাসেও মীরকাসেম আলি ইব্রাহিম খাঁকে বলেছেন — "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই।" [৫৩]

আমীর হোসেন, মহম্মদ ইরফান, মীরনশির, হায়বৎউল্লা, স্বরূপ চাঁদ, মহাতব চাঁদ, অমিয়ট, হে, মার্কার, সমরু, ড্যাল্পিটার্ট, এলিস, ওয়ারেন হেস্টিংস্ প্রভৃতি সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু উপন্যাস মধ্যে এঁদের ভূমিকা নিতান্ত সামান্য। সে কারণে এঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন কম। কেবল ওয়ারেন হেস্টিংস্ সম্পর্কে সামান্য কিছু বলার আছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে হেস্টিংস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন — "ইতিহাসে ওয়ারেন হেস্টিংস্ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্মঠলোক কর্তব্যানুরোধে অনেক সময় পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্য রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেস্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য - সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই — তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না — কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে — ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে। ওয়ারেন হেস্টিংস্ দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ট ছিলেন।" [৫৪]

ইতিহাসে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে পরপীড়ন বিষয়ে নানা অভিযোগ আছে। তার মধ্যে তিনটি অভিযোগ গুরুতর — (১) রোহিলা জাতির ধ্বংস সাধন (২) চৈৎসিংহের প্রতি অত্যাচার (৩) অযোধ্যার বেগমদের সম্পত্তি লুণ্ঠন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র রজুমদার বলেন — "ওয়ারেন হেস্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী নানা মত প্রচলিত আছে। তৎকালীন বিখ্যাত বাগ্মী বার্ক, বিখ্যাত লেখক মেকলে ও ঐতিহাসিক মিল

— এই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হেস্টিংসের নানা অসৎ কার্যের জন্য তাঁহার বহু নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েকজন লেখকের মতে হেস্টিংসের বিশেষ কোন অপরাধ ছিল না। বরং তাঁহার অসাধারণ কর্মকুশলতা ও রাজনীতি জ্ঞানের ফলে বৃটিশ রাজশক্তি দৃঢ় ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।" [৫৫] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই বক্তব্যের পরে আমরা হেস্টিংস্ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারনাকে অবহেলা করতে পারি না। তাছাড়া ইংলণ্ডে 'হাউজ অব্ কমন্স' বাদী হয়ে 'হাউজ অব্ লর্ডস'—এ হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল বিচারে হেস্টিংস্ সেক্ষেত্রে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হেস্টিংস যে অত্যাচার করেছিলেন, সে কথা মিথ্যা নয়।

এই উপন্যাসে দলনী বেগম অনৈতিহাসিক চরিত্র। সুতরাং গুরগণ খাঁর সঙ্গে তাঁর ভগ্নী সম্পর্ক কাজে কাজেই অনৈতিহাসিক। শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরও ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। তবে প্রতাপের মতো তেজস্বী ও বীর্যবান যুবক এবং চন্দ্রশেখরের মত বাস্তব-জ্ঞানবর্জিত, পুঁথিসর্বস্ব ও ক্ষমাসুন্দর বিদ্যাযোগী সে কালে অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা নয়। এই বাস্তবতা বোধটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনার অন্তর্ভূত।

॥ সূত্র– নির্দেশ ॥

১। ভবতোষ দত্ত – চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃঃ ৯৮।

২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ১৯২।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ১৯৩।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩১।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার – বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃঃ ১৩৩।

৭। Charles Stewart – History of Bengal, 1904, p.47-48.

৮। যোগেশচন্দ্র বাগল – 'উপন্যাস প্রসঙ্গ', 'মৃণালিনী', বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩১।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ১৯২।

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

১১। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৫, পৃঃ ৫৩৩–৩৬) বলেছেন যে, বখতিয়ার সহজে বঙ্গদেশ অধিকার করতে পারেন নি; তিনি লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণা মাত্র অধিকার করতে সক্ষম হন। প্রায় একই সিদ্ধান্ত করেছেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে (নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩৩২, পৃঃ ৫৯৭–৬০৬)। এছাড়া যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস গ্রন্থেও সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গজয় কাহিনীর সমর্থন নেই।

১২। Minhaj-I-Siraj — Tabakat-I-Nasiri
Trn. by H.G.Raverty, 1970, p.555.

১৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), ১৯৮৮, পৃঃ ১৩৫–৩৬।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ১৯৩।

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।

১৬। নিখিল নাথ রায় — মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পলাশী, ১৯৭৮, পৃঃ১৩৪।

১৭। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার — বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, সোমেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত, ১৯৬৪, পৃঃ ১৪।

১৮। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় – উদ্ধৃতি, সাহিত্য প্রসঙ্গ, যোগেশ চন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ২২।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – মৃণালিনী, চতুর্থ খন্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ১৯৩।

২০। শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্কিম রজীবনী ; অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮৮, পৃঃ ২২৬–২৭।

২১। নীহার রঞ্জন রায় – বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯৮০, পৃঃ ২১০।

২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – যুগলাঙ্গুরীয়, সপ্তম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৪৩।

২৩। যোগেশ চন্দ্র বসু – বঙ্কিম স্মৃতি চিহ্ন, ১৯২৫, পৃঃ ৩১।

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – যুগলাঙ্গুরীয়, প্রথম পরিচ্ছেদ (পাদ টীকা), বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৩৭।

২৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভূমিকা, চন্দ্রশেখর ; উদ্ধৃতি, উপন্যাস প্রসঙ্গ, যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৬।

২৬। বিজিত কুমার দত্ত – বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, পৃঃ ৯৭।

২৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – চন্দ্রশেখর, প্রথম খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৩৫১।

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, প্রথম খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ: ৩৫১।

২৯। V.A.Smith — Oxford History of India,1958, p. 470.

৩০। R.C.Majumder & Others — An Advanced History of India, 1981, p.663.

৩১। Syed Gholam Hossein — Seir-Mutaqherin Trn. by M.Raymond, 1902, p.387.

৩২। Syed Gholam Hossein — Ibid, p.465.

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ:৩৩২।

৩৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২–৬৩।

৩৫। Syed Gholam Hossein — Seir Mutaqherin Trn. by M.Raymond, 1902, p.389.

৩৬। Ibid, p. 421.

৩৭। Ibid, p. 464.

৩৮। Ibid, p. 502 (Foot Note No.267).

৩৯। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় — মীরকাসিম, ১৩২৮, পৃ: ১৭৯–৮০।

৪০। নিখিল নাথ রায় — মুর্শিদাবাদ কাহিনী, জগৎ শেঠ, ১৯৭৮, পৃ: ৪৫–৪৬।

৪১। বিজিত কুমার দত্ত — প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৯।

৪২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ:৪০৮।

৪৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪১০।

৪৪। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করার কথা Ghulam Husain Salim - এর Riyazv-S-Salatin (1904) গ্রন্থে আছে (p.396).

৪৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, পরিশিষ্ট, বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খন্ড, ১৯৮০ (পুনর্মুদণ), পৃঃ ১৭৮-৭৯।

৪৬। R.C.Majumder — An Advanced History of India, 1981, p.664.

৪৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খন্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪১৮।

৪৮। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯-৬০।

৪৯। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬।

৫০। Syed Gholam Hossein — Seir Mutaqherin, Tr. by M.Raymond, 1902, p.485 (Foot note - 257)

৫১। Col. Mallesson — Decissive Battles of India, উদ্ধৃতি, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, মীরকাসিম, ১৩২৮, পৃঃ ১৫৫ (পাদটীকা)।

৫২। Ghulam Husain Salim — Riyazu-S-Salatin, Trn. & Ed. by Abdus Salam, 1904, p.392 (Footnote).

৫৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪১২।

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪১২।

৫৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলা দেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২১।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ ইতিহাসের আদর্শায়ন ॥

(আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী ও সীতারাম)

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের ভূমিকায় আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন — "শেষ জীবনে বঙ্কিম যে সব গল্প রচনা করেন, তাহার পিছনে একটা করিয়া ইতিহাসের চিত্রপট ঝুলাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ধরা যায় না। তাহারা অতিমাত্রায় রোমান্টিক এবং ঊর্ধ্বপ্রবাহিনী ভাবধারা দ্বারা চালিত হওয়ায়, বারো আনারও অধিক কল্পনার দেশে গিয়াছে, — নিছক ইতিহাস হইতে বড় দূরে।" [১] পক্ষান্তরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন —' এই দ্বিতীয় কথাটি যদি আমরা স্বীকার করি, তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্যন্ত ঐ শ্রেণীর উপন্যাস সাতখানিকে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক উপন্যাস নাম দিতে হয়।" [২] অথচ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী ও 'সীতারাম' উপন্যাসকে ঐতিহাসিক বলে কখনো দাবি করেন নি। যদিও উপন্যাস তিনটিই ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে তিনটিতে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের পটভূমিতে তাঁর চিন্ময়ী মাতৃভূমি এবং অনুশীলনাদর্শের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন।

॥ আনন্দমঠ ॥

আনন্দমঠ (১৮৮২) উপন্যাস ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র গড় মান্দারণের কাহিনীর মতো ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কাহিনীও তাঁর খুল্লপিতামহের কাছে প্রথম শুনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন — "বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল', 'অজন্মা' এই সকল কথার সর্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১২৭৬ সালে) ফসল হইল না ; এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহেস্থর, পরে ধনবানদের আহার

বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেন না টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এইরূপ অবস্থাতে বসে নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোতা ছিল, তাহারাও অন্যভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল ; কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন।" [৩]

'আনন্দমঠ' উপন্যাস ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র মন্বন্তরের এক অসাধারণ এবং অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন — " ১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা তুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখিনা, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা — তাহার বড় বড় চূড়ওয়ালা ধাম দূর হইতে দেখা যায় — সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথ-ফুল্লকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল - লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষা-কালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয় ! — উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত-জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিত আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে ? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পালাইল, যাহারা পালাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পালাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল — জ্বর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না ; কেহ কাহাকে দেখে না ; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ

করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পালায়।" [৪]

মন্বন্তরের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, তা' যে কেবল খুল্লপিতামহের কাছে গল্প শুনে এবং কল্পনার সাহায্যে অঙ্কন করেছেন তা' নয়। এই বিবরণ তিনি হাণ্টারের গ্রন্থ থেকেও নিয়েছেন। হাণ্টার মন্বন্তরের পূর্বাভাস দিতে গিয়ে লিখেছেন –

"In the early part of 1769 high prices had ruled owing to the partial failure of crops in 1768 .... Inspite of the complaint and forbading of the local officers, the authorities at head quarters reported that the land-tax had been rigorously enforced; and the rents of 1769 .... seemed for a time to promise to relief .... The September harvest, indeed was sufficient to enable the Bengal Council to promise grain to Madras on a large scale, not withstanding the high prices. But in that month the periodical rains prematurely ceased, and the crop which depended on them for existence withered — 'The fields of rice; wrote the native superintendent of the Bishenpore at a later period, are become like field of dried straw." [৫]

হাণ্টার মন্বন্তরের অত্যন্ত মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিবরণ প্রায় অবিকল হাণ্টার থেকে গ্রহণ করেছেন। হাণ্টার লিখেছেন —

"All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their implements of agriculture, they devoured their seed-grain, they sold their sons and daughters till at length no longer than any children could be found; they ate the leaves of trees and the grass of fields; and in June 1770 the Resident at Darbaar affirmed that the

living were feeding on the dead. Day and night a torrent of famished and disease sticken wretches poured in to the great cities. At an early period of the year pestilance had broken out. In March we find smallpox at Moorshedabad, where it glided through the viceregal mutes, and out of the prince syfut in his palace. The streets were blacked up with promiscuous heaps of the dying and dead." [৬]

দেশে যে মন্বন্তর আসন্ন একথা প্রভাবশালী রাজকর্মচারীরা বুঝতে পেরেছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রজার দুঃখ দূর করার কথা ভাবলেন না। পরন্তু ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর Court of Directors-কে এক পত্রে জানান হল যে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথা ভেবে সৈন্যদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য-শস্য গুদামজাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [৭] এই সঙ্গে মহম্মদ রেজা খাঁ শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। "... In April a scanty spring harvest was gathered in; and the Council acting upon the advice of its Musalman Minister of finance, added ten percent to the land-tax for the ensuing year. [৮] এই অসময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রেজা খাঁকে দায়ী করেছেন। ঐতিহাসিক স্মিথও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলেছেন — "The revenue affairs were solely incharge of Md.Reza Khan, who did not worry about the sufferings of the people. He collected the revenue almost in full and added ten percent for 1771." [৯]

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " ১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ

নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে আর ডেস্‌পাচ্‌ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" [১০] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যে কিছু তথ্যগত ঐতিহাসিক ত্রুটি আছে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, রাজ্য-শাসনে ব্যর্থতা এবং তাং জাতীয় মাদকাসক্তির কথা ইতিহাস সমর্থিত ; কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দায় তাঁর উপর বর্তায় না। কারণ, মন্বন্তরের অনেক আগেই ১৭৬৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মন্বন্তরের সময় বাংলার মসনদে আসীন ছিলেন তাঁর পুত্র সৈয়েফুদ্দৌলা।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বঙ্গের সন্ন্যাসী - বিদ্রোহের ঘটনা লইয়া 'আনন্দমঠ' রচিত হইয়াছিল। এই জন্য ইহার প্রকাশের পর অনেকে ইহার মূল ইতিহাস জানিতে উৎসুক হয়। 'দেবী চৌধুরাণীর' "বিজ্ঞাপনে" (১৮৮৪ সন) বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :

> "আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসি - বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।"

এই প্রস্তাব অনুসারে আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণে (১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজী গ্রন্থ 'Gleig's Memoirs of the Life of Warren Hastings এবং W.W. Hunter's Annals of Rural Bengal হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।' ব্যাপার যে সত্য সত্যই গুরুতর হইয়াছিল, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠে তাহা আমাদের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয়।" [১১]

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে হাণ্টার লিখেছেন —

"A set of lawless banditti', wrote the Council in 1773, known under the name of Sannyasis or Faquirs, have long infested these countries; and under pretence of religious pilgrimage, have become accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging, stealing and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practise'. In the years subsequent to the famine, their ranks were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with, and the cold weather of 1772 brought them down upon the harvest fields of Lower Bengal, burning, plundering, ravaging, in bodies of fifty thousand men. The Collectors called out the military; but after a temporary success our sepoys 'were at length totally defeated and captain Thomas (their leader), with almost the whole party, cut off'. It was not till the close of the winter that the Council could report to the Court of Directors, that a battalion under an experienced commander had acted successfully against them; and a month later we find that even this tardy intimation had been premature. On the 31st March 1773, Warren Hastings plainly acknowledges that the commander who had succeeded Captain Thomas, 'Unhappily underwent the same fate', that four battallions of the army were then actively engaged against the banditti, but that, in spite of the militia levies called from the land-

holders, their combined operations had been fruitless. The revenue could not be collected, the inhabitants made common cause with the marauders, and the whole rural administration was unhinged, such incursions were annual episodes in what some have been pleased to represent as the still life of Bengal." [১২]

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে একালের ঐতিহাসিক লিখেছেন —

"হেস্টিংসের সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা — 'সন্ন্যাসী — বিদ্রোহ'। রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতার সুযোগে অনেক সময়ই দলবদ্ধভাবে দস্যুবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা — এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালে বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে লুঠতরাজ করিয়া ফিরিত। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, ইহারা সাধুর বেশে নানা স্থানে ঘুরিত, হৃষ্টপুষ্ট ছেলে চুরি করিয়া দলবৃদ্ধি করিত, কেহ কেহ ব্যবসা-বাণিজ্যও করিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর তাহাদের উপদ্রব বাড়িয়া চলে। নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তিভ্রষ্ট জমিদার ও বেকার সৈন্যদল তাহাদের সাথে যোগ দেয়। হিন্দুরা সন্ন্যাসীদের ভক্তি করিত, সুতরাং তাহাদের কোন সন্ধান গভর্ণমেন্টকে দিত না। ফলে তাহারা অকস্মাৎ এক অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের নিকট অর্থ দাবি করিত — না দিলে বিনা বাধায় লুটপাট করিত। তাহাদের ভয়ে দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, বগুড়া, ঢাকা প্রভৃতি জিলার লোকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ১৭৭২ সনে তাহারা রংপুরের সিপাহীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এবং ইহাদের নায়ক কাপ্তেন টমাসকে হত্যা করে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সন্ন্যাসীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমন করে। প্রতি দলে একজন নায়কের অধীনে প্রায় পাঁচ সাত হাজার নাগা সন্ন্যাসী ও অন্যলোক থাকিত। ১৭৭৩ সনে কাপ্তেন এডওয়ার্ডস ও সার্জেন্ট মেজর ডগলাস ৩০০ সিপাহী নিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া উভয়েই নিহত হন এবং মাত্র বারোজন সিপাহী

প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য হেস্টিংস ভুটানের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং হেস্টিংসের অনুরোধে কাশীর রাজা চৈৎসিংহ সন্ন্যাসীদের দমনের জন্য পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। কাপ্তেন ব্রুক একদল পদাতিক সৈন্য লইয়া সন্ন্যাসীদের দমন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সমুদয় সত্ত্বেও কয়েক বৎসর পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের উৎপাত চলিতে থাকে। অবশেষে তাহারা বাংলা ও বিহার ত্যাগ করে এবং সম্ভবতঃ মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেয়।"[১৩]

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন — " তারতে মুসলমান শাসনের সেই অবনতির যুগে রাজকর্মচারীদের অসহ্য অত্যাচারের ফলে হিন্দু প্রজারা ক্ষেপিয়া বিদ্রোহী ও দলবদ্ধ হইয়া উঠিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য। " [১৪]আনন্দমঠ উপন্যাসে এই অসহ্য অত্যাচারের কথা এবং বিদ্রোহের কারণ মহেন্দ্র সিংহের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন ভবানন্দ — " দেখ, যত দেশ আছে, — মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায় ? কাঁটা খায় ? উইমাটি খায় ? বনের লতা খায় ? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুকুর খায়, মড়া খায় ? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি - বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই ? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই ? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত' প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে ?" [১৫] সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন — " তখনকার বিদ্রোহী মুসলমানের বিরুদ্ধেও হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাকে একত্র করিয়া দেখিবে ইহাই স্বাভাবিক।" [১৬]

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, 'রাজকর্মচারীদের অসহ্য অত্যাচার' কেবল হিন্দু প্রজা নয়, মুসলমান প্রজাদেরও সহ্য করতে হত। তাই সে অরাজকতার দিনে কেবল হিন্দু সন্ন্যাসীরাই নয়, মুসলমান ফকিররাও বিশৃংখলায় অংশ নিয়েছিল। যামিনী মোহন ঘোষ লিখেছেন — ".... the Muhammadan Fakir orders being organised

in imitation of Hindu Sannyasis adopted a similar dress and similar habits. It was therefore difficult to distinguish one from another." [১৭] এদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ। তাঁর দলে প্রায় দু'হাজার মুসলমান ফকির ছিল। ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৬ পর্যন্ত মজনু শাহ রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুরে উপদ্রব চালিয়েছিলেন। ১৭৮৭ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আনন্দমঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, এবং তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি ঐতিহাসিকতার ভাণ করেন নি। কিন্তু উপন্যাসের অনেক বর্ণনার সঙ্গেই আমরা ইতিহাসের বর্ণনার মিল পাই। আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি মাত্র। প্রথম ইতিহাসে বলা হয়েছে যে বিদ্রোহীরা সাধুর বেশে নানা স্থানে ঘুরত এবং হৃষ্টপুষ্ট ছেলে চুরি করে দল বৃদ্ধি করত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধ বিশারদ এবং অন্যান্য গুণে গুণবান ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী — রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত। এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।" [১৮] দ্বিতীয় — ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " এড্ওয়ার্ডস্ দেখিলেন যে, ঐ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে। শত্রুদিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন।" [১৯] তৃতীয় — ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের হাতে ইংরেজ সেনানায়ক ক্যাপ্টেন টমাস এবং ক্যাপ্টেন এড্ওয়ার্ডস্ পরাজিত ও নিহত হন। ১২ জন সৈনিক বাদে এড্ওয়ার্ডসের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। আনন্দমঠ উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি যে বিদ্রোহীদের হাতে টমাস পরাজিত হলেন এবং একজন আইরিশম্যানের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হল। উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এড্ওয়ার্ডসের পরাজয় চিত্র আঁকা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " যেমন দুই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল। ওয়ারেন্

হেস্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।" [২০] এখানে বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষভাবে এডওয়ার্ডসের মৃত্যুর কথা বলেছেন। Sannyasi and Fakir Raider in Bengal গ্রন্থে বলা হয়েছে — "..... but the fate of Captain Edwards was not known; his hat was found in the Nulla before mentioned, but the body has never been found."[২১]

তবে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান সেনাদের যে ভাবে অঙ্কন করেছেন তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন — " প্রথমেই তো পোড়ায় গলদ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সন্তানেরা' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব 'সন্ন্যাসী ফকিরেরা সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ, কাশী, ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তান-সেনা বৈষ্ণব, আর আসল সন্ন্যাসীরা ছিল শৈব, আজ পর্যন্ত তাহাদের নাগা সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, ... সত্যকার সন্ন্যাসী — ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারীও করিত ; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।"[২২] এই সব গিরিপুরীর দল যে একেবারে লুঠেরা ছিল, ওয়ারেন হেস্টিংসের রচনা পাঠে আমরা তা' বুঝতে পারি। তিনি লিখেছেন —

"Individuals of them are at all times scattered about the villages and capital towns of the province, ... they are continually seen on the roads armed with swords lances match-lock and generally loaded with heavy bundles...."[২৩]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যে দেশপ্রীতির উন্মেষ ঘটিয়েছেন তা' anachronism বা কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট। কারণ, ঐ ভাবের উন্মেষ ঘটেছিল উনিশ শতকের শেষপাদে। [২৪] এই উপন্যাসে স্থানানৌচিত্য দোষও আছে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঘটেছিল

উত্তরবঙ্গে, কিন্তু উপন্যাসের প্রথম চারটি সংস্করণে ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম। পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি।

উপন্যাসের শেষে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, ইতিহাসের এক বিশেষ সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। সত্যানন্দকে মহাপুরুষ বলেছেন —" ইংরেজ এক্ষণে বণিক্ - অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে ; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।" [২৫]

'আনন্দমঠ উপন্যাসের সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র, শান্তি প্রভৃতি চরিত্র অনৈতিহাসিক। কিন্তু এই সব চরিত্রের জীবনাদর্শ ও দেশপ্রীতি পরবর্তীকালে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার যুবক-যুবতীদের অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টির আধারে নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলন প্রদর্শন করেছেন। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান সম্পদ 'বন্দে-মাতরম্', সঙ্গীত। 'বন্দে-মাতরম্' সংগীত এবং 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বীজ 'কমলাকান্ত-এ নিহিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি সত্য, কিন্তু আশ্চর্য সৃষ্টিচাতুর্য গুণে, তিনি ইতিহাসের প্রাণস্পন্দকে আমদের উপলব্ধি করিয়েছেন।

॥ দেবী-চৌধুরাণী ॥

দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন —
" দেবী চৌধুরাণীরও (আনন্দমঠের ন্যায়) ঐরূপ একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হন্টর সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত এবং গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার 'Statistical Account' মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় কথা নয়, এবং 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী ভবানী পাঠক, গুডলাড সাহেব, লেফ্‌টেনান্ট ব্রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই

পর্যন্ত। পাঠক মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বাধিত হইব।" [২৬]

হান্টারের গ্রন্থ পাঠে ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে জানা যায় যে, - "In 1787 Leiutenant Brenan was employed in this quarter against a notorious leader of dakaits (gang robbers), named Bhawani Pathak. He despatched a native officer, with twenty-four sepys, in search of the robbers, who surprised Pathak, with sixty of his followers, in their boats. A fight took place, in which Pathak himself and three of his Leiutenants were killed, and eight wounded, besides forty-two taken prisoners.... We catch a glimpse from the Lieutant's report of a female dakait, by name Debi Chaudhrani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazs in her pay, and committed dakaitis on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title Debi Chaudhrani would emply that she was a Zamindar - probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture."[২৭]

ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে আধুনিক কালের ঐতিহাসিক লিখেছেন– " মজনুনের একজন সহযোগী অঞ্চলে জলপথে ডাকাতি করিতেন। ১৭৮৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই সাতখানা বড় নৌকা ধরা পড়ে। তাঁহার সঙ্গে দেবী চৌধুরাণী নামে একজন স্ত্রীলোকও ডাকাতি করিতেন। তিনি নৌকাতেই বাস করিতেন এবং একদল বেতনভোগী বরকন্দাজ পোষণ করিতেন। সরকারী নথিতে এই দুইজনেরই উল্লেখ আছে।

মজনুন বা ভবানী পাঠক কেহই বাঙ্গালী ছিলেন না। মজনুন শাহ আলোয়ার রাজ্যের লোক, ভবানী পাঠক আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের অনুচরগণও

বাঙ্গালী ছিল না। কিন্তু সে যুগে যে বাঙ্গালী জমিদারেরাও ডাকাতের সর্দার ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেবী চৌধুরাণী সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন।"

* * * * * * * *

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে অমর করিয়া গিয়াছেন। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের কাল্পনিক জীবনী ভিত্তি করিয়া উপন্যাস না লিখিলে আজ বাংলাদেশে কেহই তাহাদের নাম জানিত কিনা সন্দেহ।"[২৮]

'আনন্দমঠ': উপন্যাস ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের ঘটনাস্থল উত্তরবঙ্গ (বীরভূম নয়) এবং ঘটনা কালের বিস্তার আনুমানিক ১৭৬৯ থেকে ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস ইজারাদার দেবী সিংহ, ভূম্যধিকারী ও ডাকাতদের অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসের ঘটনাস্থল উত্তরবঙ্গ এবং ঘটনাকালের বিস্তার ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৬ সনের মধ্যে।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের সময়কালে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " .... বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনও কোন দেশে হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই — হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী-সিংহের ইজারা।"[২৯]

দেবী চৌধুরাণীর শ্বশুর হরবল্লভের প্রসঙ্গে আমরা দেবী সিংহের কিছু কথা বঙ্কিমের কাছে শুনেছি — " দেশের দুর্দশার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুটিয়া লইল। সেবার দেবী সিংহের খাজনা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া

নওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেস্টিংস সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারী কর্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ ; বেচা-কেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশহাজার টাকার মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকী খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। .... এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না — শেষে হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইন-কানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন কে-আইন।" ৩০

বাংলাদেশে রাজকর এবং রাজকর আদায় বিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন — " মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রথমে আকবরী জমা ছাড়াইয়া উঠেন, অনিবর্ত্তী তাহার উপর রাজকর কয়েক লাখ বাড়াইয়া দেন, এবং সর্বশেষে হতভাগ্য মীর কাসিম ইংরেজদের শোষণের ফলে মোট খাজনার পরিমাণ অসম্ভব রকম বেশী করিয়া তোলেন। কিন্তু নবাবের শাসনশক্তি যেই পলাশী ও উদুয়ানালার যুদ্ধের ফলে ভাঙ্গিয়া পড়িল, অথচ যখন ইংরেজেরা বণিকত্ব ত্যাগ করিয়া দেশশাসনের দায়িত্ব লইতে ইতস্তত: করিতে ছিলেন, কোন রকমে খাজনার টাকা আদায় হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট, ঠিক সেই সময়, সর্ব প্রথমে সীমান্ত জেলাগুলিতে শান্তি চলিয়া গেল, অরাজকতা তন্দ্রা হইতে জাগিল, প্রজা দরিদ্র হইতে লাগিল, খাজনা কোথা হইতে আসিবে ? মীর কাসিমের বর্দ্ধিত হারের জমা আদায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইল।" ৩১

ইজারাদার দেবী সিংহ অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার ও প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। ফলে " সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছাড়া রংপুরেও একটি ছোটখাট বিদ্রোহ হয়। রাজা দেবী সিংহ দিনাজপুর ও রংপুর জিলার ইজারাদার ছিলেন এবং বর্ধিত হারে জমিদারগণের নিকট হইতে জোর জুলুম করিয়া বহু অতিরিক্ত টাকা আদায় করিতেন। ফলে এই সমুদয় জমিদারেরাও প্রজাদের উৎপীড়ন করিয়া অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিত। ১৭৮২ সনে ইদ্রাকপুরের জমিদার এবং দিনাজপুরের রায়তগণ গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অভিযোগ করে। মালদহ হইতে চার্লস গ্র্যান্ট (Charles Grant)

রংপুরের কলেক্টরকে এই বীভৎস অত্যাচারের যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি : 'দরজা খুলিয়া দেওয়ায় পাঁচ ছয়টি শীর্ণকায় কঙ্কালের আকৃতি মানুষ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের দুই পা বান্ধা, হাটিবার শক্তি নাই, মনে হইল কথা বলিতেও পারে না। ইহাদের অধিকাংশই আট দশ দিন এইভাবে আটক ছিল এবং ইহার মধ্যে মাত্র দুই তিন বার দেবী সিংহের একটি চাকর দয়া করিয়া কিছু খাদ্য দিয়াছে। প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের প্রহার করা হইত, এবং পৃষ্ঠে তাহার দাগ পরিষ্কার দেখা যায়।'

বিদ্রোহীগণের আর্জিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্যান্য অতিরিক্ত করের ভারে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, ঘরদুয়ার এমন কি সন্তান পর্যন্ত বেচিয়াছে, কিন্তু তবু আমলাদের দাবি মিটাইতে না পারায় এইরূপ কারাবন্ধ হইয়া অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে।

এইরূপ অত্যাচারের ফলে নানা স্থানের রায়ৎগণ সমবেত হইয়া দুর্লভ নারায়ণের পুত্র দুর্জয় নারায়ণকে নবাব ঘোষণা করিল এবং ডাকালিগঞ্জের কয়েদখানার ফটক খুলিয়া কয়েদিগণকে মুক্ত করিল। ক্রমে আরও অনেক রায়ৎ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং সকলে মিলিয়া প্রতীকারের জন্য ডিমলার গোমস্তার নিকট গেল। গোমস্তার বরকন্দাজদের গুলিতে কয়েকজন রায়ৎ মরিল, কিন্তু লড়াই আরম্ভ হইল এবং গোমস্তা ধৃত ও নিহত হইল।

ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। দিনাজপুরে রায়ৎগণ আমলাদিগকে মারিয়া কাছারী লুট করিল। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র হাতে করিয়া দল বাঁধিয়া অগ্রসর হইল এবং দলে দলে নানা পরগণার রায়ৎগণ তাহাদের দলে যোগ দিল। তখন সৈন্য পাঠাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হইল। এই বিদ্রোহ দমনের পর যে সরকারী তদন্ত কমিশন বসান হয় তাহাতে দরিদ্র প্রজাদের উপর কি ভাবে উৎপীড়ন করিয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়াও অনেক টাকা আদায় করা হইত এবং তাহার ফলে প্রজাদের চরম দুর্দশার কাহিনী পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দেবী সিংহ হেস্টিংসের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি এতদূর অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" ৩২

দেবী সিংহের এই অত্যাচার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট মিনিস্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্‌ বার্ক্‌ সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বতোৎকীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্ত-কাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল — আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল।" ৩৩

ইতিহাস পাঠে আমরা জেনেছি যে, অতিরিক্ত অর্থের লোভে দেবীসিংহ জমিদারদের উপর এবং জমিদারেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। এর ফলে মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে যে অরাজকতা এবং অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানীপাঠক, প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরাণীর কাছে 'ওজস্বী বাক্যপরম্পরার সংযোগে' ডুম্যধি-কারীদের সেই 'দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করেছেন — " কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুরিয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায় কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাড়িতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে, যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ব সমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়।" ৩৪

আমরা 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কাহিনীকালে দেশের অবস্থা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করলাম। আমরা জানলাম ইজারাদার দেবী সিংহ, অপরাপর জমিদারগণ এবং ডাকাতদের অত্যাচারের কথা। দেশে চোর-ডাকাত সৃষ্টির প্রধান কারণ দেবী সিংহ ও জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্য্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর ডাকাত। কাহার

শাসন করে ? গুডল্যাড্ সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।" [৩৫] আচার্য যদুনাথ সরকার দেবী চৌধুরাণীর কাহিনীকাল এবং সে সময়ের দেশের অবস্থা চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা সম্পর্কে বলেছেন — " .... যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ 'দেবী চৌধুরাণী'র সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য। খাঁটি বাঙ্গালীরাও ডাকাতি করিত। .... আর, হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এদেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম মহাপণ্ডিত ছিলেন, বহু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পড়াশোনা ছিল, এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে তিনি পঠিত জ্ঞানকে পরিপাক করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবী চৌধুরাণী'র জন্য কাল ও স্থান, এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসন পদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই — এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল ; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক।" [৩৬]

দেবী চৌধুরাণী রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সূত্র ভিন্ন কিংবদন্তী ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেছেন। প্রফুল্লর প্রভূত ধন প্রাপ্তি সম্পর্কে তিনি আমাদের একটি কিংবদন্তীমূলক কাহিনী বলেছেন। গৌড়ের মুসলমান নবাব কর্তৃক উত্তরবঙ্গের হিন্দু রাজা নীলাম্বরের রাজ্য আক্রমন এবং নীলাম্বরের পরাজয় ও বন্দির ইতিহাসের কথা। দেবী চৌধুরাণী ভিন্ন 'বিবিধ প্রবন্ধ'এর 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' নামক প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। কিন্তু " যুদ্ধের পূর্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধন সকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে কোথায় ধন রহিল।" [৩৭] কৃষ্ণগোবিন্দের মাধ্যমে এই ধন প্রফুল্লের হস্তগত হল;— এটি কিংবদন্তী কথা। এখানে ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তীকে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে একসূত্রে গেঁথে তুলেছেন।

দেবী চৌধুরাণী রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন — " আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি — কথায় কথায়

ডাকাইতের কথা বলিতেছি — ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল - কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।" [৩৮] এ থেকে অনুমান হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল দেখে থাকবেন। যার ভিত্তিতে তিনি একথা বলেছেন এবং জঙ্গলের বর্ণনা করেছেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, " ফলতঃ ওয়ারেন হেস্টিংস পদত্যাগ করিবার পরে এই সব ডাকাতদের দমন হয় এবং 'দেবী'ও অদৃশ্য হন।" [৩৯]ইংরেজদের হাতে দেবী ধরা পড়েছিলেন বা সংঘর্ষে দেবীর মৃত্যু হয়েছিল এমন কোন বিবরণ আমরা পাই না। উপন্যাসের শেষেও আমরা দেখি যে দেবীরাণী তাঁর দল ভেঙে দিয়েছেন এবং সাগরকে বলেছেন — " .... দেবী মরিয়া গিয়াছে। .... প্রফুল্লও মরিয়াছে। .... আমি নূতন বৌ।" [৩৯ক] সুতরাং দেবীর পরিণামে ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু ভবানী পাঠক প্রায়শ্চিত্তের জন্য ইংরেজের হাতে ধরা দিয়ে দোষ স্বীকার করলেন এবং তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল — বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিবরণ ইতিহাস সম্মত নয়। কারণ ১৭৮৭ সনের জুলাই মাসে ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে ভবানী পাঠকের দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন তত্ত্বটি অনৈতিহাসিক বলে বর্জন করতে হয়। কারণ, ভবানী পাঠক ডাকাত ছিলেন এবং তিনি এ জাতীয় তত্ত্বের ধার ধারতেন না।

দেবী চৌধুরাণী ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না।এই উপন্যাসে তিনি ব্যষ্টির আধারে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই কারণে তিনি দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে চাননি। তবু এর ঐতিহাসিক অংশের সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না।

সীতারাম

সীতারাম (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ, ১২৯১) থেকেই 'সীতারাম' উপন্যাস প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 'প্রচার'-এর প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ও 'হিন্দুধর্ম' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে বাঙালীর বীরত্ব এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। আর বাঙালীর বাহুবলে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা মাথায় রেখেই 'সীতারাম' উপন্যাস রচিত।

সীতারাম উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "সীতরাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছু রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Westland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করুন।" [80] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে ইতিহাসের দিকটিকে অস্বীকার করেছেন।

পক্ষান্তরে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন — "বাঙ্গালীর বল এবং সুসংস্কৃত হিন্দু-ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামের' সূচনা। পরিষৎ - সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় বলেন, 'গ্রন্থশেষে (পরিষৎ - সংস্করণের 'সীতারাম') 'পাঠভেদ' অংশে কয়েকটি পরিত্যক্ত পরিচ্ছেদের সহিত "প্রচারে' প্রকাশিত উক্ত অংশ মিলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে দিয়া 'হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনে'র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন'। কিন্তু পরে বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বপ্ন তাঙ্গিয়া চুরিয়া 'সীতারাম'কে এই শোচনীয় ও ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতেই পরিণত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে হইলে এরূপ না করিয়া হয়ত উপায়ও ছিল না।" [৪১] বাগল মহাশয়ের মতে ইতিহাসের দিকটিকে স্বীকার করতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুরাজ্য স্থাপনের ' স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র

গল্পের অনুরোধে সত্যকে বিকৃত করেন নি।

আচার্য যদুনাথ সরকারও বলেছেন — " .... বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাঙ্গালার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য ; ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচন্ড অপলাপ করেন নাই ; ইতিহাসে পরিচিত কোন বিখ্যাত সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ বলিয়া অঙ্কিত করিলে যে দূষিত কল্পনা হইত, সীতারামে কোথাও তাহা হয় নাই। এর উপর সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধ বিগ্রহ - প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য।" [৪২] অর্থাৎ ঐতিহাসিক 'সীতারাম' উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্যতাকে মর্যাদা দিয়েছেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার আমাদের আরও জানিয়েছেন যে, — " বঙ্কিমের 'সীতারাম' ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার ঐতিহাসিক সত্যাসত্যতা লইয়া অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোর-খুলনার ইতিহাস' দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হইবার ফলে ঐ সব পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে এবং সীতারামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে জানা গিয়াছে।" [৪৩] অর্থাৎ সীতারামের ঐতিহাসিকতা বিচারের চাবিকাঠি আমরা পাচ্ছি।

ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার রাজা সীতারাম রায়ের ইতিহাস এই ভাবে বিবৃত করেছেন — " সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল সুবাদারের আনুগত্য স্বীকার করিত। কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন বারো-ভূঁইদের মতনই স্বাধীনচেতা। তাঁহার পিতা ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের অধীনে একজন সামান্য রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার সরবাদারের নিকট হইতে নলদি (বর্তমান নড়াইল) পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার পান। কথা ছিল যে, তিনি নিয়মিত ভাবে সুবাদারের প্রাপ্য রাজস্ব দিবেন এবং বিদ্রোহী আফগান ও দস্যুর দল হইতে ঐ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাঁহার সততা ও দক্ষতার ফলে বাংলার সুবাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার তাহার হাতে দেন। এই ভাবে সীতারাম একদল সৈন্য

সংগ্রহ করেন। তিনি সুবাদারকে নিয়মিত টাকা পাঠাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং প্রবাদ এই যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ করেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপে আকৃষ্ট হইয়া বহু বাঙালী সৈন্য তাঁহার সহিত যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণা হইতে দশ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তীরে বাগজানী গ্রামে এক সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, একজন মুসলমান ফকিরের অনুরোধে তিনি নূতন রাজধানীর নাম রাখেন মহম্মদ-পুর। এবং অনেক মন্দির, সুরম্য হর্ম্য, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ এবং বৃহৎ বৃহৎ দীঘি কাটাইয়া ইহার গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। প্রথমে সুবাদার ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯–১৬৯৭ খ্রিঃ) দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এবং পরে সুবাদার আজিমুস্সানের সহিত মুর্শিদকুলী খানের কলহের সুযোগ লইয়া তিনি পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করেন। অবশেষে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে হত্যা করেন। এইবার মুর্শিদকুলী খান সীতারামের শক্তি ও ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ভূষণার ফৌজদারকে একদল সৈন্যসহ পাঠাইলেন। পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সেনাদলও সুবাদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল। এই মিলিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিন্দুরাজ্যের পতন হইল। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে অমর করিয়া গিয়াছেন।" [৪৪]

আচার্য যদুনাথ সরকার সীতারামের যে ইতিহাস জানিয়েছেন তা' নিম্নরূপ –

"Sitaram Ray of Bhushna, an Uttar Rarhi Kayatha, and the son of the Hindu Collector under the Muslim Foujdar of Bhushna (16 miles east of Magura in the Khulna district) took a lease of the Naldi Pargana (Modern Narail) from the Bengal Subadar, promising to pay the revenue regularly and to suppress the rebel Afgan and bandit gangs of that tract (c.1688) .... He is even said to have secured an imperial forman and title of Raja

by paying tribute to the Emperor of Delhi. To keep up this new dignity he founded as new capital at the Village of Bagjani (10 miles from Bhushna) and named it Muhammadpur (in honour of Muslim saint) .... In pride of power, he humbled and robbed the smaller Zamindar of the country round and stopped sending any revenue to the Subadar ....

At last in 1713 when he killed Sayyid Abu Turb, the Foujdar of Hugli, Murshid Quli could no longer overlook his audacity. A strong force was detached under Murshid Quli's relative Baks Ali Khan (newly appointed Foujdar of Bhushna); and with the help of all the neighbouring Zamindars levis, Sitaram was overwhelmed and captured with his family, and his capital was sacked (February - March 1714). Thus fell the last Hindu Kingdom in Bengal." [৪৫]

বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনী সূচনা করেছেন প্রায় একশ' আশী বছর আগে পূর্ববঙ্গের ভূষণা নগরীতে। আমরা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'প্রায়' শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করছি। কারণ, 'সীতারাম' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯১ সনের শ্রাবণ মাসে, 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। সে সময় থেকে একশ' আশী বছর পিছনে হিসাব করলে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ পাচ্ছি। কিন্তু 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা ১৭০৪খ্রিস্টাব্দের আগে। যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন — " ১৬৯৯ হইতে ১৭১২ পর্যন্ত সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিষ্কণ্টক রাজসুখ ভোগ করিলেন।" [৪৬] গঙ্গারামের সঙ্গে ফকিরের বিবাদ ইত্যাদি ঘটনার পরেই সীতারাম রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হন। সুতরাং সীতারাম উপন্যাসের কাহিনী সূচনা ১৬৯৯খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে হওয়াই সম্ভব। এই কারণে 'প্রায়' শব্দের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনীকাল ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে থেকে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

উপন্যাসের সূচনাতে গঙ্গারামের সঙ্গে ফকিরের বিবাদকে কেন্দ্র করে, গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবন্ত সমাধির হুকুমের ঘটনাটি, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা-প্রসূত অসম্ভব ঘটনা নয়। সে যুগের বাংলাদেশে এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন — "বাঙ্গালাদেশে সেই সময়ে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা ঘটে, অহা সলিমুল্লা ও গুলাম হুসেন সালিম নিজ নিজ ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন;: একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া উহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহা সাজাইয়া বৃন্দাবনের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া একটি ছোট দেওয়াল খাড়া করিল এবং উহাকে মসজিদ নাম দিল। যখনই বৃন্দাবন ঐ পথে চলিতেন, ফকির উচ্চস্বরে আজান পড়িত। বৃন্দাবন উত্যক্ত হইয়া একদিন কয়েকখানা ইট ফেলাইয়া দিলেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ফকির গিয়া মুর্শিদ কুলীর নিকট নালিশ করিল। বিচারক কাজী মুহম্মদ শরফ্ উলেমাদের লইয়া আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন।" [৪৭]

সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ মধুমতী নদীর তীরে শ্যামনগর নামে একটি জোতের বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। উপন্যাসে আমরা দেখছি যে, গঙ্গারামকে উদ্ধার করার পর সীতারাম তাকে শ্যামপুরে যাবার কথা বলেছেন। পরে সীতারামও সেখানে এসে উপস্থিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন সম্পর্কে লিখেছেন — "মধুমতী নদীর তীরে শ্যামপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈতৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। .... যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে সীতারামের আশ্রয়ে ঘর দ্বার বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচরবর্গ এবং খাদক, যে যেখানে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্তৃক আহূত হইয়া আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। এইরূপে ক্ষুদ্রগ্রাম শ্যামপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া বৃহৎ নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগরনির্মাণে মনোযোগ দিলেন। .... তিনি রাজপ্রাসাদতুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলীশোভিত সরোবর, এবং রাজকর্ম সকল নির্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। .... কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহণ করিলেন না; ....। .... এই সময়ে চাঁদশাহ নামে একজন মুসলমান ফকির, সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। তাঁহার পরামর্শমতে, নব সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সীতারাম রাজধানীর নাম রাখিলেন 'মহম্মদপুর'।" [৪৮]

মধুমতী নদীর তীরে সীতারামের সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী রাজধানী নির্মাণ এবং তার 'মহম্মদপুর' নামকরণ ইতিহাস সম্মত। সতীশচন্দ্র মিত্র সীতারামের রাজধানীর স্থান নির্বাচনের প্রশংসা করে বলেছেন — "মহম্মদপুরের অবস্থান,অতি সুন্দর। উহার তিন দিকে বিল, এক দিকে নদী, মধ্যস্থানে উচ্চস্থল। তৃষণার দিকে অর্থাৎ প্রধানতঃ যে দিক হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা, সেই পূর্বদিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখার দ্বারা দক্ষিণ দিক্ দুষ্প্রবেশ্য করা যায়। অপর দুই দিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই।" [৪৯] A Report of the District of Jessore গ্রন্থে J. Westland সীতারামের রাজধানীর যে বিবরণ দিয়েছেন,বিজিত কুমার দত্ত তার সার-সংকলন করে লিখেছেন — "সীতারামের দুর্গ ছিল চতুষ্কোণ। রামসাগর, সুখসাগর নামে দুটি দীঘি তিনি খনন করেন। রাজার কাচারী, দোলমন্দির, কোষাগার, সিংহ-দরজা, শিবমন্দির, তোষাখানা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কৃষ্ণমন্দির ইত্যাদি সীতারামের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রথযাত্রা এবং নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদির বর্ণনায় বুঝতে পারি লোকে তখন মোটামুটি সীতারামের রাজত্বে ভালোই ছিল।" [৫০]

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিন জন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিনজন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুতর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারু-রূপে নির্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়ের নাম মৃন্ময়, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃন্ময় এবং ক্ষিপ্রতায় গঙ্গারাম।" [৫১] গঙ্গা-রামের কোন ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু চন্দ্রচূড় ও মৃন্ময়ের কিছু

ঐতিহাসিক পরিচয় আছে। যদুনাথ সরকার লিখেছেন — "বিশাল নলদী পরগণা হাতে আসার ফলে সীতারামের আয় ও লোকবল দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার দুইজন বড় বন্ধু জুটিল ; একজন রঘুরাম (পক্ষান্তরে রামরূপ) ঘোষ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ, বীর ও পালোয়ান, মেনাহাতি এই ডাকনামে খ্যাত সেনাপতি হইলেন। অপরজন মুনিরাম রায়, বর্গজ কায়স্থ, উকীল (মন্ত্রনাদাতা অর্থাৎ ফরেন সেক্রেটারী) হইলেন। তাঁহার দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী (উপাধি মজুমদার) বোধ হয় বঙ্কিমের চন্দ্রচূড় হইবেন।" [৫২] যদুনাথ কথিত মেনাহাতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপনয়সে মৃন্ময়। যদুনাথ গাঙ্গুলী বা চন্দ্রচূড় এবং মেনাহাতি বা মৃন্ময় সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত বিবরণ সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সীতারাম উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মুর্শিদকুলী খাঁ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন — "আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যাধম মুরশিদ্ কুলি খাঁ * মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল — বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না।" [৫৩] এই সঙ্গে তারকাচিহ্নিত করে মুরশিদ্ কুলি খাঁ সম্পর্কে তিনি পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন — "ইংরেজ ইতিহাস বেত্তাগণের পক্ষপাত এবং কতকটা অজ্ঞতা নিবন্ধন সেরাজউদ্দৌল্লা ঘৃণিত এবং মুরশিদ্ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুরশিদের তুলনায় সেরাজউদ্দৌলা দেবতা বিশেষ ছিলেন।" [৫৩ক]

মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রতিষ্ঠিত নবাবী আসল ও শাসনের প্রধান পরিবর্তন হিন্দু জমিদার-দেরউৎপত্তি । ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "যে সকল জমিদার নিয়মিত রাজস্ব দিতেন মুর্শিদকুলী খান তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন এবং কোন উপরি পাওনার দাবি করিতেন না। কিন্তু নির্ধারিত তারিখে রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে তিনি রাজস্ব বিভাগে কর্মচারী ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। খাদ্য বা পানীয় কিছুই দেওয়া হইত না। ঐ রুদ্ধ কক্ষেই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে করিয়া

তাঁহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা হইত, এই গর্তের নাম দেওয়া হইয়াছিল বৈকুণ্ঠ। অনেক সময় খাজনা দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আমিল, জমিদার প্রভৃতিকে স্ত্রীপুত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুল্য যে এইসব আমিল ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া খাজনা আদায় করিতেন।" ৫৪

মুর্শিদ কুলি খাঁ যে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করতেন তা' ঐতিহাসিক সত্য। সেই সঙ্গে তিনি অতিরিক্ত রাজস্বের আশায় দেশের মানুষকে নানা ভাবে শোষণও করতেন। এ সম্পর্কে যদুনাথ সরকার, চন্দন নগরের ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবদের প্যারিস নগরীতে কর্তাদের পাঠান রিপোর্টের (Kaeppelin, La Compagie Indes Orientales et. F. Martin) অংশ বিশেষ অনুবাদ করে আমাদের জানিয়েছেন— " বাদশাহ কর্তৃক অসামান্য ক্ষমতা-যুক্ত হইয়া স্বর্গে প্রেরিত নূতন দেওয়ান (মুর্শিদ কুলি খাঁ) নিজেই ঘৃণিত লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পন্থা হইতেই নিবৃত্ত থাকিলেন না। .... সমস্ত প্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হইতে লাগিল, টাকা অধিক হইতে অধিকতর দুষ্প্রাপ্য হইল, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা ধরিল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।" ৫৫

তবে এটাই মুর্শিদকুলি খাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর চরিত্র অনেকটা আলো-আঁধারের মতো দোষ ও গুণের সমন্বয়ে গঠিত। মুর্শিদকুলি খাঁ অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। স্টুয়ার্ট মুর্শিদকুলি খাঁর প্রশংসা করতেগিয়ে গ্লাডউইনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন —

"Excepting Shaisteh Khan there has not appeared in Bengal, nor indeed in any part of Hindoostan, an Ameer who can be compared with Moorshed Cooly, for zeal in propagation of faith for wisdom, in the establishment of laws and regulations; for munificence and liberality, ... for rigid and impartial justice, ... in short whose whole administration so much tender to the benefit of mankind and the glory of the creator." ৫৬

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "মুর্শিদকুলী খান গুণের আদর করিতেন এবং তাঁহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়া কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ অধিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে মুসলমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয়া অথবা কার্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বহু ধন অর্জন করিয়া রাজা, মহারাজা প্রভৃতি খেতাব পাইলেন। জগৎশেঠের ন্যায় ধনী হিন্দুরাও ক্রমে নবাবের দরবারে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।" [৫৭] মুর্শিদ কুলি খাঁ অত্যন্ত প্রবল হিন্দুদ্রোহী হলে এটা সম্ভব হত না। তাই বোধ হয় তাঁকে 'মহাপাপিষ্ট' 'মনুষ্যাধম' বলা ঠিক নয়।

সীতারাম উপন্যাসের তৃতীয় খন্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িল। সে সকল ঐতিহাসিক সত্য।" [৫৮] সীতারামের ভূষণা অধিকার ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু মৃন্ময়ের হাতে তোরাব্ খাঁর মৃত্যু ঐতিহাসিক সত্য নয়। তোরাব্ খাঁর মৃত্যু হয়েছিল সীতারামের হাতে। 'রিয়াজ-উস-সালতিন'-এর বিবরণ অনুসারে সীতারামকে ধরবার জন্য তোরাব্ খাঁ তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ পীর খানকে দুশো সৈন্য আনতে বললে

".... On being apprised of this Sitaram concentrating his forces lay in ambush to attack aforesaid general (Pir Khan). One day Mir Abu Turab with a number of friends went out for hunting, and in that heat of the chase alighted on Sitaram's frontires Pir Khan was not in Abu Turab's Company. The Zaminder (Sitaram) on hearing of this fancing Mir Abu Turab to be Pir Khan suddenly issued out from the forest with his forces and attacked Mir Abu Turab from the rear. Although the later with a loud voice announced his name, sitaram not hearing it inflicted wounds on Abu Turab with bamboo-clubs, and felled him from his horse." [৫৯]

স্টুয়ার্ট বলেছেন যে সীতারাম তোরাব্ খাঁকে চিনতে না পেরে হত্যা করেন এবং "When Sitaram found that it was the Foujdar he had slain, he much regretted the circumstances,..."[৬০] এই প্রসঙ্গে মৃন্ময়ের মৃত্যু প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "প্রাতে উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমনে আসিতেছে ....। সংবাদ পাইবামাত্র মৃন্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহন করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছুদূর গিয়া মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পালাইতে জানিতেন না, সুতরাং তাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।"[৬১] কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার জানিয়েছেন যে, মৃন্ময় বা মেনাহাতি স্নানের সময় অতর্কিত আক্রমনে নিহত হন।[৬২]

মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজার মতো রাজত্ব শুরু করলেও সীতারাম রাজা নাম ধারণ করেন নি। "কেননা দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন।"[৬৩] পরবর্তীকালে সীতারাম দিল্লী গিয়েছেন এবং বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি ও ফর্মান পেয়েছেন। তবে যদুনাথ সরকার বলেন — "সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকীল (অর্থাৎ দূত) দ্বারা সুবাদারকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সুপারিশে দিল্লীর দরবার হইতে 'রাজা' উপাধি ও জমিদারী ফর্মান আনিয়া মহাগৌরবে স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।"[৬৪] খুব সম্ভব রাজা প্রতাপাদিত্য স্বয়ং দিল্লীতে গিয়ে যেভাবে ফর্মান পান, বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রভাবে সীতারামকে দিল্লী প্রেরণ করেছেন।

রাজা হবার পর ১৭১৩খ্রিস্টাব্দে সীতারাম রায় ভূষণার ফৌজদার আব্দু তোরাবকে হত্যা করে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনেন। মুর্শিদকুলি খাঁ সীতারামকে দমন করার জন্য নতুন ফৌজদার ও তাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য জমিদারদের সেনারা যুক্ত হয়। যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত হন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর সীতারামের শেষ পরিণতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিরামশূন্য গভীর গর্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত

লৌহপিন্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পালাইতে লাগিল। সূচী ব্যূহের পথ সাফ। তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্র কন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমান কটক কাটিয়া বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুটিতে লাগিল। এইরূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।" ৬৫

কিন্তু ইতিহাস পাঠে আমরা জানি যে, সীতারাম যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী হন এবং তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। যদুনাথ সরকার লিখেছেন — " মুর্শিদাবাদে সীতারামের নৃশংস প্রাণদন্ডের বিবরণ সলিমুল্লার তারিখ–ই–বাংগালাতে এবং পরে স্টুয়ার্টের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁহার পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৭১৪, এবং মৃত্যুর সময় বোধ হয় সেই বৎসরের অক্টোবর মাস (সতীশ, ২য় খন্ড,)৫৮৯–৬০০ পৃ:)।" ৬৬

সীতারামের প্রাণদন্ড সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অজানা ছিল না ; কিন্তু তবু যে তিনি সীতারামকে 'বৈরিশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ' করিয়াছেন, তার প্রধান কারণ বোধ হয় বাংলাদেশের শেষ হিন্দু রাজার প্রতি দুর্বলতা। তবে বিষয়টি যে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন,ছিলেন। সে কারণে উপন্যাসের পরিশিষ্ট অংশে বঙ্কিমচন্দ্র রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের কথোপকথনে বিষয়টি আমাদের সামনে এনেছেন —

" রাম । রাজা–রাণীর কি হলো, কিছু ঠিক খবর রাখ ?

শ্যাম । শোনা যাচ্ছে, তাঁদের না কি বেঁধে মুরশিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রাম । আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুনতে পাই যে, তাঁরা পথে বিষ খেয়ে মরেছে। তারপর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।" ৬৭

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে সীতারামের বিষপানে মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন Westland. [৬৮]

সীতারামের রূপতৃষ্ণা, রূপ-তৃষ্ণা থেকে ভোগস্পৃহা, ভোগস্পৃহা পূরণের জন্য রাজ্যের কুলবধূ ও কুলকন্যাদের অপহরণ করে বলপূর্বক উপভোগ কারণে ধর্মচ্যুতি এবং রাজকার্য পালনে অবহেলাই সীতারামের পতনের কারণরূপে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে সতীশ চন্দ্র মিত্র বলেন — " রমণীবর্গের সংশ্রবই যে রাজার পতনের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। হয়ত সীতারামের পতনের অন্য কারণ ছিল। তাঁহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, ... ইহা ভিন্ন তাঁহার উপপত্নী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা বলিতে পারি না। অন্ততঃ ছিল বলিয়া পরিচয় পাই নাই। স্ত্রীলোক সংগ্রহের দিকে যে তাঁহার লালসা ছিল, রাজ্য দখল করিবার সময় তিনি কাহাকেও জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছেন বা রাজবলের অপব্যয়ে কোন পরস্ত্রীকে করায়ত্ত করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বন্দী পরিবারের মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না। সুতরাং, পঞ্চাশ বৎসরের রণক্লান্ত বীর শত যুবতীর সঙ্গে আমোদ প্রমোদের দিনক্ষয় বা দেহক্ষয় করিতেন, এমন 'রচা' গল্প আমি বিশ্বাস করি না।"[৬৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম – এই তিনটি উপন্যাসেই অত্যাচারের পটভূমিকায় নবীন শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আনন্দমঠে, মহাপুরুষের মতে, সন্তান – বিদ্রোহের কারণ, ইংরেজকে রাজ্য-শাসন গ্রহণে বাধ্য করা। দেবী চৌধুরাণীর ডাকাতি প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম-সাধনা। কিন্তু সীতারামের সংগ্রামের উদ্দেশ্য 'হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠা'। মুসলমানের অত্যাচারের পট-ভূমিতে " হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?" [৭০] শ্রী-র এই উক্তিই সীতারামের অন্তরে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করে তাঁকে বিদ্রোহী এবং হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু ছিল ; সীতারামের উক্তি – " তুমি শ্রী। এত সুন্দরী !"[৭১] অর্থাৎ রূপ-তৃষ্ণার প্রাবল্য। সীতারাম আপন বল, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা গুণে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও আত্মসংযমের অভাবে তার পতন হল। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামে ইতিহাসের তথ্য বিকৃত করেন নি আবার উপন্যাসের সত্যকেও রক্ষা করেছেন। তিনি ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে অসাধারণ সৃষ্টি-চাতুর্য গুণে অনুশীলন তত্ত্বকে যুক্ত করে সীতারামের মহান ট্র্যাজেডি অংকন করেছেন।

॥ সূত্র - নির্দেশ ॥

১। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, 'দুর্গেশনন্দিনী', ১৩৫৮, পৃঃ ৫।

২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, 'আনন্দমঠ' ১৩৬৪, পৃঃ ৭।

৩। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪, পৃঃ ১০৭–৮।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৬৪।

৫। W.W.Hunter — The Annals of Rural Bengal, Vol. I, 1872, p.20-21.

৬। W.W.Hunter — Ibid, p.26-27.

৭। উদ্ধৃতি, — Hunter's The Annals of Rural Bengal, Vol.I, Appendix-B,1872, p.399.

৮। W.W.Hunter — Ibid, p.23.

৯। V.A. Smith — Oxford History of India,1958, p.508.

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৭১।

১১। যোগেশচন্দ্র বাগল — উপন্যাস প্রসঙ্গ, আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪২।

১২। W.W.Hunter — The Annals of Rural Bengal, Vol.I, 1872, p.70-72.

১৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২১—২২।

১৪। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, আনন্দমঠ, ১৩৬৪, পৃঃ ১০।

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, দশম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৭৫।

১৬। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত — বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭২, পৃঃ ১৫৮।

১৭। J.M. Ghosh — Sannyasi and Fakir Raider in Bengal, 1930, p.12.

১৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৯৩।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭২৮।

২০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, চতুর্থ খন্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৩২।

২১। J.M.Ghosh — Sannyasi and Fakir Raider in Bengal , 1930, p.58.

২২। যদুনাথ সরকার — 'ঐতিহাসিক ভূমিকা', আনন্দমঠ, ১৩৬৪, পৃঃ ১২–১৩।

২৩। উদ্ধৃতি J.M.Ghosh — Sannyasi and Fakir Raider in Bengal, 1930, p.58.

২৪। Humayun Kabir — The Bengal Novel, 1968, p.14.

২৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৩৫।

২৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিজ্ঞাপণ, দেবী চৌধুরাণী ; উদ্ধৃতি - যোগেশচন্দ্র বাগল, উপন্যাস প্রসঙ্গ, দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৪।

২৭। W.W.Hunter — A Statistical Account of Bengal, Vol.II, 1875, p.158-59.

২৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২১–২২।

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৫০।

৩০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৬৯।

৩১। যদুনাথ সরকার – ঐতিহাসিক ভূমিকা, দেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৭, পৃঃ ৭।

৩২। রমেশচন্দ্র মজুমদার – বাংলাদেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড), ১৯৮১, পৃঃ ২৪–২৫।

৩৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৫০।

৩৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃঃ ৭৬৭।

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), পৃঃ ৭৫১।

৩৬। যদুনাথ সরকার – 'ঐতিহাসিক ভূমিকা', দেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৭, পৃঃ ৫।

৩৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৭৫৪।

৩৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় খন্ড, দশম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১০৯১, পৃঃ ৭৮৬।

৩৯। যদুনাথ সরকার – 'ঐতিহাসিক ভূমিকা', দেবী চৌধুরাণী, ১৩৬৭, পৃঃ ৫।

৩৯ক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – দেবী–চৌধুরাণী, তৃতীয় খন্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী, (১মখন্ড) ১৩৯২, পৃঃ ৮১৮।

৪০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিজ্ঞাপন, সীতারাম ; উদ্ধৃতি — যোগেশ চন্দ্র বাগল, উপন্যাস প্রসঙ্গ, সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৭।

৪১। যোগেশ চন্দ্র বাগল — উপন্যাস প্রসঙ্গ, সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৪৬।

৪২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৫।

৪৩। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৫।

৪৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৩৮৫, পৃঃ ২১০–১১।

৪৫। Jadu Nath Sarkar — History of Bengal, Vol.II, 1948, p.416.

৪৬। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ১১।

৪৭। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ১৩।

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৩৪–৩৫।

৪৯। সতীশচন্দ্র মিত্র — যশোহর - খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৯৬৫, পৃঃ ৫৫০।

৫০। বিজিত কুমার দত্ত — বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৩৬৯, পৃঃ ১২৬।

৫১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৩৫।

৫২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৭।

৫৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৪৫।

৫৩(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪৫ (টীকা)।

৫৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৩৮৫, পৃঃ ২১১–১২।

৫৫। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ১১।

৫৬। উদ্ধৃত Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p. 460.

৫৭। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৩৮৫, পৃঃ ২১২–১৩।

৫৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৬৬।

৫৯। Ghulam Husain Salim — Riyazu-S-Salatin, Trn. & Ed. by Abdus Salam, 1904, p.266.

৬০। Charles Stewart — History of Bengal, 1904, p.433.

৬১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৯৮।

৬২। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৮।

৬৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, প্রথম খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮৩৫।

৬৪। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৭।

৬৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৯০৪।

৬৬। যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, ১৩৬২, পৃঃ ৯।

৬৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — সীতারাম, তৃতীয় খন্ড, পরিশিষ্ট, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৯০৫—৬।

৬৮। J.Westland -- A Report of the District of Jessore, 1874, p. 27-28.

৬৯। সতীশচন্দ্র মিত্র – যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড), ১৯৬৫, পৃঃ ৫৮৩-৮৪।

৭০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – সীতারাম, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৮২৪।

৭১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২৩।

।। উপসংহার ।।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ছিলেন না। কিন্তু "বাংলাদেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি শ্রদ্ধানম্রচিত্তে স্মরণ করবেন।"[১] কারণ, তিনিই "বাংলা ইতিহাস-রচনার প্রথম প্রেরণাদাতা।"[২] এবং তিনিই "বঙ্গদেশে প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।"[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র কোন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন নি। কিন্তু ইতিহাস রচয়িতাদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কালজয়ী সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন — "কোন দেশের ইতিহাস লিখতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল ? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে — কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র।"[৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাবধান-বাণী থেকে আমরা ইতিহাস-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনার গভীরতাকে উপলব্ধি করতে পারি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার ভিত্তিতে তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-রচনায় অনুসরণযোগ্য প্রণালী সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারি।

"প্রত্যেক জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখী হয়ে থাকে। সমাজরূপ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সেই লক্ষ্যানুযায়ীই পরিবর্তিত হয়।"[৫] ঐতিহাসিক যদি সে 'লক্ষ্য' সন্ধানে ব্যর্থ হন তবে জাতির ইতিহাস রচনাও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তারা বাংলা-দেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই 'লক্ষ্য' সন্ধানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং 'দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম' করতে না পারায় ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে 'অনর্থক কালহরণ' করেছেন।

ইতিহাস রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা ও নিরন্তর অধ্যবসায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন — "যাহা বলিতেছি

বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব।" [৬] 'বাঙ্গালার নব্য লেখক-দিগের প্রতি নিবেদন'-এ তাঁর উক্তি — "যে কথার প্রমাণ-দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।" [৭] "তিনি স্বয়ং (বঙ্কিমচন্দ্র) এ ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি কিছু বেশী পরিমানে প্রমাণ কণ্টকিত। কখনও কখনও সামন্য একটি তথ্যের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রচুরতম প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। যেখানে ঐতিহাসিক প্রমাণের নিতান্ত অভাব, সেখানে বাস্তব যুক্তিবিদ্যার আশ্রয় নিতে দেখা গেছে।" [৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে — "যাহা অসত্য .... বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য। .... তাহা একেবারে পরিহার্য্য।" [৯] অন্যত্র তিনি বলেছেন — "যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে।" [১০] প্রত্যক্ষভাবে না হলেও এই বক্তব্যের যে অন্তর্নিহিত ভাব, তা থেকে বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনার পক্ষপাতী ছিলেন।

কেবলমাত্র নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ তথ্যসংগ্রহই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সেগুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করাই ঐতিহাসিকের অন্যতম প্রধান কাজ। ডঃ জীবেন্দ্র রায় বলেন — "..... ইতিহাসের ঘটনা-সর্বস্বতাকে মূল্যায়ণের সারাৎসার করা তাঁর (বঙ্কিম-চন্দ্রের) মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। তিনি সব সময়েই কার্য পরম্পরা আবিষ্কারে যত্নবান।" [১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইতিহাসের আলোচনা পদ্ধতি হবে অস্পষ্টতাবর্জিত এবং বিস্তৃত। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের একটি সামগ্রিক এবং পূর্ণতর রূপ দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তিনি বলেছেন — "এ বিষয়ে যতদূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর। কোন্ রাজবংশ কোন্ কোন্ প্রদেশ কতকাল শাসন করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান কর। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লিখ।" [১২] একক প্রচেষ্টায় এই সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখা সম্ভব নয় বলে তিনি

সমষ্টিগত প্রচেষ্টার কথা বলেছেন — " আইস আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য সে ততদূর করুক, ক্ষুদ্রকীট যোজন ব্যাপী দ্বীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয় সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।" [১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র কালক্রমানুসারে ইতিহাস রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি লিখেছেন — " সন্ তারিখশূন্য যে ইতিহাস' — সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য — প্রবেশের উপায় নাই ....।" [১৪] কালক্রমানুসারে ঘটনাবলীর পারম্পর্য রক্ষা করে ইতিহাস রচনা করার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারনা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল এবং তাঁর এই সচেতনার পরিচয় আমরা পাই 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব' - এ। সেখানে তিনি লালমোহন বিদ্যানিধির (১৮৪৫–১৯১৬) 'সম্বন্ধ নির্ণয়' পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে পুস্তক-টির ১৬১ পৃষ্ঠায় সম্বতের সঙ্গে খ্রিষ্টাব্দের হিসাবের একটি ভুল অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে নির্দেশ করেছেন। [১৫]

ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র Cross Examination প্রণালীর কথা বলেছেন। তাঁর মতে — " দেশীয় এবং বিপক্ষ দেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাস-বেত্তাদিগের সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ নির্ণীত হয় না।" [১৬] রবীন্দ্রনাথও বলেছেন — " .... ইতিহাস একতরফা না হইয়া দুইতরফা হইলে সত্য–নির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক একভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্যভাবে সাক্ষী সাজাইবেন — তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।" [১৭] লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রও এই Cross Examination এর সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। যেমন, বল্লাল সেনের সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — " বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লাল সেন দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০৯১ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০৯১ শকাব্দ – ১০২৭ খ্রী: অব্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেকদিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লাল সেন তাহার পূর্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রী: অব্দে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।" [১৮] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন — " .... এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার

চেষ্টা করি, বহু সত্যসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইয়া যত্ন করি, তিনিও (বঙ্কিমচন্দ্রও) তেমনি করিয়া সেরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।" [১৯]

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রায়ই বাঙ্গার ইতিহাসের সঙ্গে ইউরোপের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ইতিহাসের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এর ফলে " ইতিহাসজ্ঞান ও ইতিহাসপ্রীতি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রস্তাবগুলির সরলতা ও আকর্ষণ বেড়েছে।" [20] বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা দুটি উদাহরণ দিতে পারি :-

(ক) " ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বর্গুণ্ডী, আঁজুপ্রবেন্স প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত। কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল।" [২১]

(খ) " সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হয় নাই ? ইংরেজ নর্মানের অধীন হইয়াছিল, জার্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আটশত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচশত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না।" [২২]

ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নৃ-তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নেওয়ার কথা বলেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত নৃ-তত্ত্বের আলোচনা খুব বেশী প্রসার লাভ

করেনি। যদিও 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধটি রচনার সময় তিনি দুটি তত্ত্বই প্রয়োগ করেছিলেন, তবে ভাষাতত্ত্বের উপরই সমধিক গুরুত্ব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন - "প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া এ সকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ।"[২৩]

ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যগুণ ও আবেগধর্মিতাকে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন — " .... মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর; — ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, ইহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান ; ঐতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন ; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই - মহাভারতও হইতে পারে না।" [২৪] অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আবেগবহুলতা ও কাব্যগুণ লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ত্রুটি নয় বিশিষ্টতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল জাতীয়তাবাদী চিন্তা। এ সম্পর্কে T.W.Clark বলেছেন — " .... the nationalism which Bankim's writings foreshadowed was a Hindu nationalism." [২৫]
তাঁর মতে — "Though he never explicitly said so, the implication of .... (the) terminological usage ('Hindu' as 'Indian') is clear : Muslims are not Indians, they are aliens." [২৬]

বঙ্কিমচন্দ্র 'তবকাতৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থের লেখক মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এবং 'সিয়র-মুতক্ষরিণ' গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেন এর সমালোচনা করতে গিয়ে উভয়ের সম্পর্কেই " গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমান " [২৭] বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এ ধরনের মন্তব্য লক্ষ্য করেই T.W.Clerk বলেছেন —

"Bankim's references to Muslims are generally unfriendly, and in many places unmistakably hostile." [২৮]

এ প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির কথা বলতে পারি। সেখানে আমরা দেখব যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে, হিন্দু - মুসলমান ভেদজ্ঞান করেন নি। রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখ তাঁর কাছে সমান সহানুভূতি পেয়েছে। এ ছাড়া 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের ওসমান এবং 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের মীরকাসেম চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে মহৎচরিত্ররূপে অঙ্কিত। সীতারাম উপন্যাসের চাঁদ শাহ 'ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী'। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদের প্রতি 'hostile' ছিলেন এমত গ্রহণ যোগ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মুসলমানদের দ্বেষক ছিলেন না, আমাদের এ মতের সমর্থনে, আমরা বিনা মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিবেদন উদ্ধৃত করছি — "গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে — হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই — হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক — সেই নিকৃষ্ট।" [২৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস সাধনায় স্বদেশপ্রীতি ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চা পদ্ধতির মণিকাঞ্চন যোগ স্থাপিত হয়েছিল। স্বদেশের 'গৌরবোজ্জ্বল' ইতিহাস উদ্ধার তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের মতে — "স্বজাতিহিতৈষী বঙ্কিম আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে উদ্ধার করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন .... বাঙালী তথা ভারতবাসীর গৌরবোজ্জ্বল .... ইতিহাস।" [৩০]

বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস-চর্চার বিষয়ে যতটা আগ্রহ ও সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে ততটা করেন নি। কিন্তু সে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চিন্তাকে ছোট করে দেখা চলে না। কারণ, ভারতের অন্তর্গত কোন বিশেষ প্রদেশ নিয়ে যদি কেউ ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে তাকে ভারত চিন্তার বিরোধী বলা যায় না। তবে সামগ্রিক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে চিন্তা করেছেন ; তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধ।

বাংলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাংলার ইতিহাস রচনায় তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়কে যেমন সাফল্যজনক ভাবে প্রবৃত্ত করাতে পেরেছেন তেমনি বাংলার আধুনিক ইতিহাস লেখকদেরও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর ইতিহাস চিন্তার মধ্যে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' সংকীর্ণতা হয়ত কিছু ছিল, হয়ত তাঁর ইতিহাস চর্চার সাফল্যও ছিল সীমিত ; কিন্তু, তবু সে প্রচেষ্টা ও সাফল্যকে আমরা অবহেলা করতে পারি না।

বাংলার ইতিহাস সাধনা সম্পর্কে একদা বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপোক্তি ছিল যে, — "যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। .... কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি — এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।" [৩১] "মৃত্যুর (১৮৯৪) অল্পকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপোক্তি। কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনার জন্যে তিনি যে পথ প্রদর্শন ও প্রেরণাদান করে গেলেন, তাঁর মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরেই সে পথে সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সেনাপতিদের আগমনবার্তা শোনা যেতে লাগল।" [৩২]

আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গেতিহাস চর্চা ও চেতনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র মিত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পুরাতত্ত্ববেত্তাবৃন্দ আবির্ভূত হয়ে বাংলার ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রটি নক্ষত্র-খচিত করে তুললেন। আধুনিক কালে যোগেশ চন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ প্রমুখের গ্রন্থপাঠ করে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে আদর্শের অনুপ্রেরণা আজও বিনষ্ট হয়নি। পিতা যেমন পুত্রের মাঝে, গুরু যেমন শিষ্যের মাঝে অমর ; বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনাও তেমনি তাঁর উত্তরসাধকদের মাঝে ভাস্বর। সে চেতনার বলেই আমাদের অতীত গৌরব উদ্ধার পেয়েছে, বর্তমান গৌরব রক্ষিত হচ্ছে এবং ভাবী গৌরব সমৃদ্ধি পাবে।

।। সূত্র – নির্দেশ ।।

১। ভবতোষ দত্ত – চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃঃ ৯১।

২। প্রবোধচন্দ্র সেন – বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ১।

৩। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় – ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র, নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২।
উদ্ধৃতি, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত) বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), সাহিত্য প্রসঙ্গ, ১৩৯২, পৃঃ ২২।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৪০।

৫। সত্যনারায়ণ দাশ – বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা, ১৯৭৪, পৃঃ ১০৯।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪১।

৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ২৭৩।

৮। সত্যনারায়ণ দাশ – প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০।

৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭২।

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভারত-কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ২৩৫।

১১। জীবেন্দু রায় – বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত চিন্তা : সূত্র ও প্রকৃতি, ১৯৮৪, পৃঃ ৮৯।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ:৩৩৯।

১৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৭।

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৪৩।

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার–দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩২৪।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ভারত কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ২৩৫।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ, 'ইতিহাস' (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত), ১৩৬৮, পৃ: ১১৮।

১৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার - দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩২৪।

১৯। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

২০। সত্যনারায়ণ দাশ – প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১।

২১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৯।

২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ:৩৩৩।

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার উৎপত্তি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৫১।

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৪১২-১৩।

২৫। T.W.Clark — The Role of Bankimchandra in the Development of Nationalism : C.H.Philips (ed.) - Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1967, p.440.

২৬। Ibid, p.439.

২৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৭।

২৮। T.W.Clark — Ibid, p.439.

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — রাজসিংহ, উপসংহার, গ্রন্থকারের নিবেদন, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ: ৬৬১।

৩০। দ্বিজেন্দ্র লাল নাথ — আধুনিক বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৭, পৃ: ২২১।

৩১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিজ্ঞাপন, বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ), বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ১০৩১।

৩২। প্রবোধচন্দ্র সেন — বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃ: ২৩।

।। গ্রন্থপঞ্জী ।।

॥ক॥

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য – বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন,
জিজ্ঞাসা,
কলিকাতা, ১৯৭১।

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় – মীরকাসিম,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স,
কলিকাতা, ১৩২৮।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস – মহাভারতম্ (১ম খন্ড),
(অনুবাদ ও সম্পাদক - হরিদাস
সিদ্ধান্তবাগীশ)
সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়,
কলিকাতা, ১৩৩৮।

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত – বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক,
ফার্মা, কে·এল·মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা, ১৯৬৫।

জীবেন্দু রায় – বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত চিন্তা : সূত্র ও
প্রকৃতি, সাহিত্যশ্রী,
কলিকাতা, ১৯৮৪।

দ্বিজেন্দ্র লাল নাথ – আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য
জিজ্ঞাসা,
কলিকাতা, ১৩৬৭।

নলিনী নাথ রায় (অনু: ও সম্পা:) — ছান্দোগ্যোপনিষৎ,
বসুমতী সাহিত্য মন্দির,
কলিকাতা, ১৩৫৯।

নিখিল নাথ রায় — মুর্শিদাবাদ কাহিনী
পুথিপত্র,
কলিকাতা, ১৯৭৮।

নীহার রঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি,
কলিকাতা, ১৯৮০।

প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত — উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম,
সান্যাল এন্ড কোম্পানী,
কলিকাতা, ১৩৬৮।

প্রবোধ চন্দ্র সেন — বাংলার ইতিহাস সাধনা,
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,
কলিকাতা, ১৯৯২।

প্রভাত কুমার ঘোষ — গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি
জে•এস•প্রকাশনী,
কলিকাতা, ১৯৮৮।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড),
যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত,
সাহিত্য-সংসদ,
কলিকাতা, ১৩৯১।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড),
যোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত,
সাহিত্য সংসদ,
কলিকাতা, ১৩৯২।

বদরুদ্দীন উমর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ,
চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ,
কলিকাতা, ১৩৮৮।

বিজন বিহারী গোস্বামী (অনু ও সম্পাঃ) — অথর্ববেদ সংহিতা,
হরফ প্রকাশনী,
কলিকাতা, ১৯৭৮।

বিজিত কুমার দত্ত — বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,
মিত্র ও ঘোষ,
কলিকাতা, ১৩৬৯।

ভবতোষ দত্ত — চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র,
প্যাপিরাস,
কলিকাতা, ১৩৯৪।

ভবতোষ দত্ত — বঙ্কিম ভাবনালোক,
অণিমা প্রকাশনী,
কলিকাতা, ১৯৮৮।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী — কবিকঙ্কন চন্ডী (২য় খন্ড)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা, ১৯২৬।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, দুর্গেশনন্দিনী
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
কলিকাতা, ১৩৫৮।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, আনন্দমঠ
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
কলিকাতা, ১৩৬৪।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, দেবীচৌধুরাণী, (ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬৭।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম, (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬২।

যোগেশ চন্দ্র বসু — বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি চিহ্ন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৯২৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ইতিহাস, (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত) বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৬৮।

রমা প্রসাদ চন্দ — ইতিহাসে বাঙালী, কে·পি·বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮১।

রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮৮।

P.Banerjee & Others (ed.) — Hundred Years of the University of Calcutta, University of Calcutta, Calcutta, 1957.

Rajendralal Mitra — Indo Aryan, Vol. II, W.Newman, Calcutta, 1881.

Rajendralal Mitra — History of Society, Centenary Review of the Asiatic Society, Vol.I (1784-1884), The Asiatic Society, Calcutta, 1986.

R.C.Majumder — History of Bengal, Vol.I, University of Dacca, Dacca, 1943.

R.C.Majumder — History of Medieval Bengal, G.Bharadwaj & Co., Calcutta, 1974.

R.C.Majumder & Others — An Advanced History of India, Macmillan India Limited, Calcutta, 1981.

R.C.Majumder & Others(ed.)— The History and Culture of Indian People, Vol.VII, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1984.

বদরুদ্দীন উমর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ,
চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ,
কলিকাতা, ১৩৮৮।

বিজন বিহারী গোস্বামী (অনু ও সম্পাঃ) — অথর্ববেদ সংহিতা,
হরফ প্রকাশনী,
কলিকাতা, ১৯৭৮।

বিজিত কুমার দত্ত — বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস,
মিত্র ও ঘোষ,
কলিকাতা, ১৩৬৯।

ভবতোষ দত্ত — চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র,
প্যাপিরাস,
কলিকাতা, ১৩৯৪।

ভবতোষ দত্ত — বঙ্কিম ভাবনালোক,
অণিমা প্রকাশনী,
কলিকাতা, ১৯৮৮।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী — কবিকঙ্কন চন্ডী (২য় খন্ড)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা, ১৯২৬।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, দুর্গেশনন্দিনী
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
কলিকাতা, ১৩৫৮।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, আনন্দমঠ
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
কলিকাতা, ১৩৬৪।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, দেবীচৌধুরাণী,
(ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
কলিকাতা, ১৩৬৭।

যদুনাথ সরকার — ঐতিহাসিক ভূমিকা, সীতারাম,
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
কলিকাতা, ১৩৬২।

যোগেশ চন্দ্র বসু — বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি চিহ্ন,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স,
কলিকাতা, ১৯২৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (৫ম খন্ড),
বিশ্বভারতী,
কলিকাতা, ১৯৬৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ইতিহাস, (প্রবোধচন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন
কর্তৃক সংকলিত)
বিশ্বভারতী,
কলিকাতা, ১৩৬৮।

রমা প্রসাদ চন্দ — ইতিহাসে বাঙালী,
কে·পি·বাগচী এন্ড কোম্পানী,
কলিকাতা, ১৯৮১।

রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড),
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
কলিকাতা, ১৯৮৮।

রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলা দেশের ইতিহাস (২য় খন্ড)
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা, ১৩৮৫।

রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলা দেশের ইতিহাস (৩য় খন্ড)
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা, ১৯৮১।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খন্ড)
নবভারত,
কলিকাতা, ১৯৭৪।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খন্ড)
নবভারত,
কলিকাতা, ১৯৭৪।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — প্রথম শিক্ষা - বাঙ্গালার ইতিহাস
দি সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটোরি
কলিকাতা, ১৮৮৬।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিম জীবনী,
(অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত)
পুস্তক বিপণি,
কলিকাতা, ১৩৯৫।

সতীশচন্দ্র মিত্র — যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড)
প্রকাশক - শিবশঙ্কর মিত্র,
পরিবেশক - দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা, ১৯৬৫।

সত্যনারায়ণ দাশ — বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা,
জিজ্ঞাসা,
কলিকাতা, ১৯৭৪।

সুকুমার সেন — ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস
গ্রন্থ প্রকাশ,
কলিকাতা, ১৩৭৩।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত — বঙ্কিমচন্দ্র,
এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি: ,
কলিকাতা, ১৯৭২।

সোমেন্দ্র নাথ বসু (সম্পা:) — কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র,
বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড,
কলিকাতা, ১৯৬৪।

॥ খ ॥

A.A.Macdonel — A History of Sanskrit Literature,
Motilal Banarasidass,
Delhi, 1971.

Abul Fazal — Akbarnama, Vol. III,
Trn. by A.Baveridge,
The Royal Asiatic Society of Bengal,
Calcutta, 1939.

A.C.Gupta (ed.) — Studies in the Bengal Renaissance,
The National Council of Education,
Bengal, Calcutta (Jadavpur), 1958.

Beni Prasad — History of Jahanagir,
The Indian Press (Publication) Pvt.Ltd.
Allahabad, 1962.

Bankim Chandra Chatterjee — Bankim Rachanavali, Vol.III,
Sahitya Samsad,
Calcutta, 1969.

C.M.Philips (ed.) — Historians of India, Pakistan and Ceylon,
Oxford University Press,
London, 1967.

Charles Stewart — History of Bengal,
Bangabasi,
Calcutta, 1904.

Ghulam Husain Salim — Riyazu-S-Salatin,
Trn. by Maulavi Abdus Salam
The Asiatic Society,
Calcutta, 1904.

H.Blochmann — Contribution to the Geography and History of Bengal (Muhammadan period)
The Asiatic Society,
Calcutta, 1968.

Humayan Kabir — The Bengali Novels,
Firma K.L.Mukhopadhyay,
Calcutta, 1968.

Jadu Nath Sarkar — History of Bengal, Vol.II,
University of Dacca,
Dacca, 1948.

John Clark Marshman — History of Bengal,
Serampore Press,
Serampore, 1871.

Kalhana — Rajtarangini,
Trn. & Ed. by Vishva Bandhu,
Vishvesh Varanandan Vedic
Research Institute,
Hoshiarpur, 1963.

Kautilya — Arthashastra,
Trn. & Ed. by Raghu Nath Singh
Krishnadas Academy,
Varanasi, 1983.

L.S.S.O.Malley — Bengal District Gazetters; Hooghly
Govt. of Bengal,
Calcutta, 1912.

Minhaj-I-Siraj — Tabakat-I-Nasiri,
Trn. by H.G.Raverty,
Oriental Books Reprint Corporation,
Delhi, 1970.

N.K.Sinha — The History of Bengal; 1757-1905
University of Calcutta,
Calcutta, 1967.

Richard Burn (ed) — The Cambrige History of India, Vol. IV, S.Chand, New Delhi, 1963.

Roper Lethbridge — An Easy Introduction of the History and Geography of Bengal, Thacker, Spink & Co., Calcutta, 1874.

Sahdhyakarnandin — Ramcharitam Trn. & Ed. by R.C.Majumder & Others The Varendra Research Museum, Rajshai, 1939.

Sibdas Choudhuri (Comp. & Ed.) — Proceedings of the Asiatic Society, Vol.I (1784-1800), The Asiatic Society, Calcutta, 1980.

Syed Gholam Hossein — Seir Mutaqherin, Trn. by M.Raymond, R.Cambray & Co., Calcutta, 1902.

Tapan Kumar Roy Choudhuri — Bengal Under Akbar and Jehangir, A.Mukherjee & Co., Calcutta, 1953.

V.A.Smith — Oxford History of India, P.Spear Oxford Clarendon Press, Oxford, 1958.

W.W.Hunter — The Annals of Rural Bengal, Vol.I
Smith Elder,
London, 1872.

W.W.Hunter — A Statistical Account of Bengal,Vol.VII
Fribner,
London, 1875.

॥গ॥

আকাদেমি পত্রিকা, ২য় সংখ্যা,
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,
কলিকাতা, ১৯৮৯।

বঙ্গদর্শন (১ম খন্ড)
রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন,
কলিকাতা , ১৯৮০ (পুনর্মুদ্রণ)।

বঙ্গদর্শন (৩য় খন্ড)
রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন,
কলিকাতা, ১৯৮০ (পুনর্মুদ্রণ)

বঙ্গদর্শন (৪র্থ খন্ড)
রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন,
কলিকাতা, ১৯৮০ (পুনর্মুদ্রণ)।

বঙ্গদর্শন (৯ম খন্ড)
রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন,
কলিকাতা, ১৯৮০ (পুনর্মুদ্রণ)।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,
কলিকাতা, ১৩৪৭।

॥ ঘ ॥

Asiatic Researches

Vol. I, VI, IX,

Cosmo Publications

New Delhi, 1979 (Reprint).

সম্মুখ চিত্র

পার্শ্ব চিত্র

চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক আবিষ্কৃত গরুড় স্তম্ভ চিত্র

HISTORY OF BENGAL.

FOR

BEGINNERS.

BY

RAJ KRISHNA MOOKHERJEA M. A. AND B. L.

প্রথম শিক্ষা।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল বিরচিত।

CALCUTTA

PRINTED BY BEHARY LALL BANERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS,
115, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
NO. 30 BECHOO CHATTERJEE'S STREET.

1874.

মূল্য ।৹ চারি আনা।

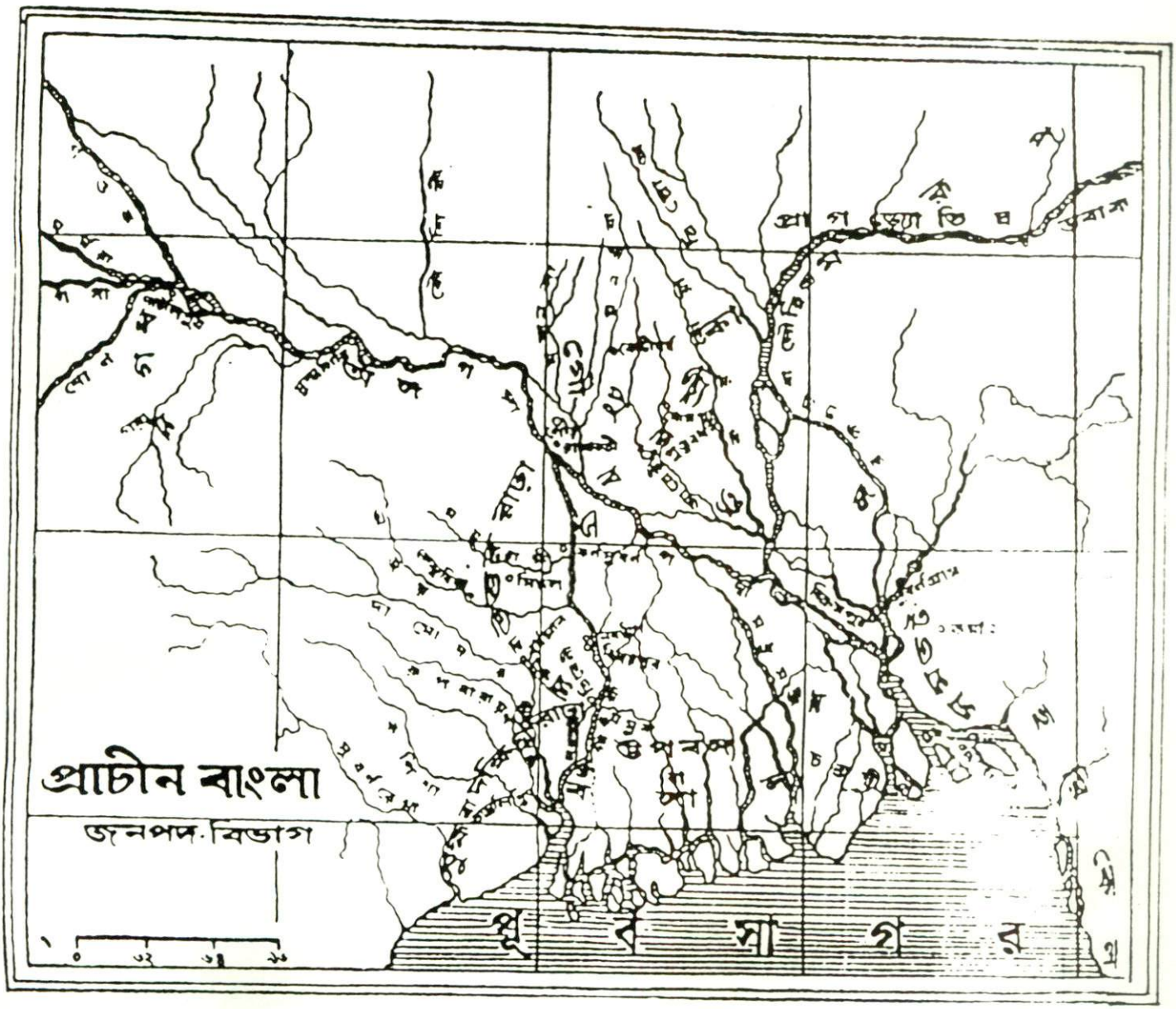
প্রাচীন বাংলা
জনপদ-বিভাগ
পূর্ব সাগর

চম্পা
গঙ্গা
গৌড়
রামাবতী
সোমপুর
পুণ্ড্রবর্ধন
কর্ণসুবর্ণ
নবদ্বীপপুর
তাম্রলিপ্তি
উপবঙ্গ
প্রাচীন
রাঢ়
পূর্ব সাগর

NORTH BENGAL
Uni

P.Banerjee & Others (ed.) — Hundred Years of the University of Calcutta, University of Calcutta, Calcutta, 1957.

Rajendralal Mitra — Indo Aryan, Vol. II, W.Newman, Calcutta, 1881.

Rajendralal Mitra — History of Society, Centenary Review of the Asiatic Society, Vol.I (1784-1884), The Asiatic Society, Calcutta, 1986.

R.C.Majumder — History of Bengal, Vol.I, University of Dacca, Dacca, 1943.

R.C.Majumder — History of Medieval Bengal, G.Bharadwaj & Co., Calcutta, 1974.

R.C.Majumder & Others — An Advanced History of India, Macmillan India Limited, Calcutta, 1981.

R.C.Majumder & Others(ed.) — The History and Culture of Indian People, Vol.VII, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1984.